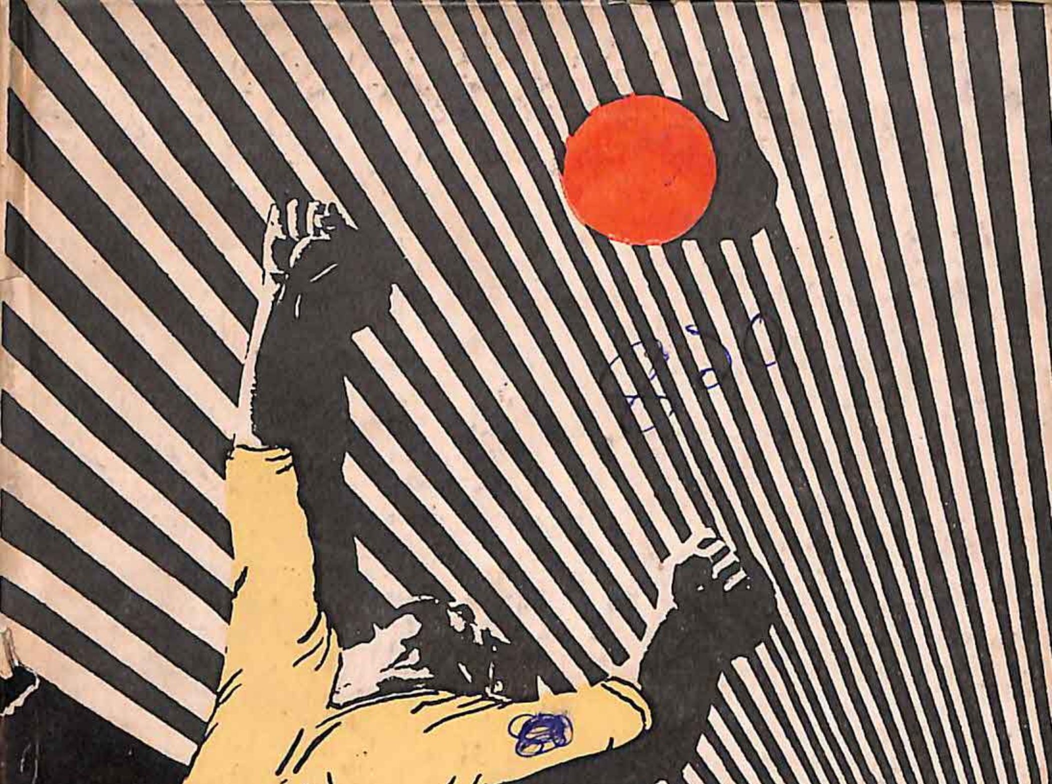


স্ট্রাইকার

মতি নন্দী

স্ট্রাইকার

স্ট্রাইকার

মতি নন্দী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৭০ পঞ্চম মুদ্রণ জানুয়ারী ১৯৮২
ষষ্ঠ মুদ্রণ জানুয়ারী ১৯৮৪
সপ্তম মুদ্রণ জানুয়ারী ১৯৮৭ মুদ্রণ সংখ্যা ৩৩০০
প্রচ্ছদ অসিত পাল গ্রন্থস্বত্ব আনন্দরূপা নন্দী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ১২·০০

মৈত্রেয় দাশগুপ্ত-কে

এই লেখকের অন্যান্য বই

নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান
দুঃখের বা সুখের জন্য
ননীদা নট আউট
ক্রিকেটের আইনকানুন
স্টপার
বারান্দা
কোনি

স্বীকার

॥ ১ ॥

কাল রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি।

আমাদের গলিটা এঁকেবেঁকে তিনটে মোড় ঘুরে যেখানে বড় রাস্তায় পড়েছে, একটা বিরাট সাদা মোটর গাড়ি সেখানে এসে থামল। অত বড় গাড়ি আমাদের পাড়ার লোকেরা কখনো দেখেনি। তাই তারা ভীড় করে গাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামল কুচকুচে কালো এক মধ্যবয়সী বিদেশী। মুখে চুরুট, চোখে কালো চশমা, গাড়ির রঙের মতনই পরনে সাদা কোট ও ট্রাউজারস। চুল কাঁচাপাকায় মেশা।

ভীড়ের দিকে তাকিয়ে, বিদেশী হাত নেড়ে পোরতুগীজ ভাষায় কী বলল। আমার পাড়ার লোকেরা বাংলা এবং একটু-আধটু ইংরেজি, হিন্দী আর ওড়িয়া ছাড়া কোন ভাষা বোঝে না। তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকল। বিদেশী আবার কথা বলল। কথার ভঙ্গিতে বোঝা যায়, কিছু একটা জানতে চাইছে বা খোঁজ করছে।

ভীড় থেকে নুটুদা এগিয়ে গেলেন। "কেয়া মাঙ্‌তা, কী চাই?" তারপর মনে মনে কয়েকটা কথা তর্জমা করে বললেন, "হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট?"

এবার বিদেশী পরিষ্কার বাংলায় বলল, "প্রসূন ভট্টাচার্য নামে একটি ছেলে কি এই রাস্তায় বাস করে?"

বিদেশীর মুখে বাংলা শুনে ওরা থতমত হয়ে অবাক হল, ভরসাও পেল। সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলে ভনভন করে বলে উঠল— প্রসূন? প্রসূন! প্রসূন!! কী দরকার? কেন এসেছে লোকটা?

"প্রসূন, মানে অনিল ভটচাজের বড় ছেলে?"

"হ্যাঁ, তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।" বিদেশী আশ্বস্ত হয়ে নুটুদাকে বলল। নুটুদা আমাদেরই পাশের ঘরের আর এক ভাড়াটে। ছাপাখানায় কমপোজিটারের কাজ করেন। বছর দুয়েক আগে ওঁর স্ত্রী মারা গেছেন। সংসারে একমাত্র মেয়ে নীলিমা ছাড়া আর কেউ নেই। মানুষটি অতি সরল, সাদামাঠা, দোষের মধ্যে অযাচিত উপদেশ দেন, বারোয়ারী একটা কিছুর, রবীন্দ্র-জয়ন্তী বা শীতলা পুজোর সুযোগ পেলেই চাঁদা তুলতে শুরু করেন। ছেলেবুড়ো সবাই ওকে নুটুদা বলে ডাকে। নীলিমা প্রায় আমারই বয়সী। ক্লাস টেন-এ পড়ে, সারাদিন পরিশ্রম করে ঘরে-বাইরে। ওর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব।

নুটুদা সন্দিহান চোখে সেই বিদেশীকে বললেন, "প্রসূনের সঙ্গে কেন দেখা করবেন?"

বিদেশীর চুরুটটা নিভে গেছল। লাইটার জ্বেলে সেটা ধরাতে ধরাতে বলল, "আমি ব্রাজিল থেকে আসছি। স্যানটোস ফুটবল ক্লাবের বোধহয় নাম শুনেছেন। আমি সেই ক্লাবের ম্যানেজার। প্রসূন যদি রাজী হয়, আমরা ওকে নেব।"

নুটুদা বললেন, "নেবেন মানে?"

বিদেশী ব্যস্ত হয়ে বলল, "এজন্য নিশ্চয় টাকা দেবে আমার ক্লাব। বছরে একবার বাড়ি আসার প্লেন ভাড়াও।"

"কত টাকা দেবেন শুনি?"

বিদেশী সতর্কভাবে বলল, "সেটা ওর বাবার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করব। প্রসূন তো এখনো নাবালক। আমরা সব খবর সংগ্রহ করেছি। ওর বয়স এখন সতেরো বছর চার মাস।"

নুটুদা বিদেশীকে নিয়ে আমাদের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। পিছনে পাড়ার লোকের মিছিল। আমাদের বাড়িতে যেতে হলে আড়াই হাত চওড়া একটা মাটির গলিতে ঢুকতে হয়। একতলায় আমরা আর নুটুদারা ভাড়া থাকি দেড়খানা করে ঘর নিয়ে। দোতালায় থাকে বাড়িওয়ালা বিশ্বনাথ দত্ত। তার চার মেয়ে।

দুজনের বিয়ে হয়ে গেছে।

বিশ্বনাথ বা বিশুবাবু বাড়ি থেকে তখন বের হচ্ছিলেন, হঠাৎ একজন বিদেশীর পিছনে সারা পাড়ার লোককে গলিতে ঢুকতে দেখে ভড়কে গেলেন। তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকে সেজো মেয়ে সোনামুখীকে পাঠিয়ে দিলেন। বিশুবাবুর পুলিশকে ভীষণ ভয়।

বাবা ঘরে চৌকিতে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মা রান্নাঘরে। আমরা দুই ভাই এক বোন। আমার পর পিন্টু, তারপর পুতুল। নুটুদা বাড়িতে ঢুকেই "অনিলবাবু! অনিলবাবু!" বলে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে শুরু করলেন। বাবা গম্ভীর প্রকৃতির, অত্যন্ত কম কথা বলেন। অধিকাংশ দিন আমার সঙ্গে তো একটাও কথা হয় না। আমি ওঁকে এড়িয়ে চলি।

"অনিলবাবু, সন্তোষ ক্লাবের ম্যানেজার এসেছে!" নুটুদা উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছেন। "জানেন তো পেলে ওই ক্লাবের প্লেয়ার!"

"কে পেলে?" বাবা ভারী গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, "কোথায় বাড়ি?"

নুটুদা থতমত হয়ে গেলেন। বিদেশী মৃদু হেসে এগিয়ে এসে বলল, "স্যানটোস ক্লাব ব্রাজিলে। স্যানটোস খুব নামকরা বন্দর, সেখান থেকে কফি চালান যায় সারা পৃথিবীতে। আমাদের ক্লাব পৃথিবীর সেরা ক্লাবগুলোর একটা। পেলে পৃথিবীর সেরা ফুটবলার। অতবড় গুণী প্লেয়ার এখনো দেখা যায়নি।"

বাবা পিছনের ভীড়ের উপর আলতোভাবে চোখ বুলিয়ে বললেন, "আমি ফুটবলের কোন খবর রাখি না। আপনার কী প্রয়োজন, বলুন।"

"আপনার ছেলে প্রসূনকে আমাদের ক্লাবে খেলাতে চাই।"

"প্রসূনের সঙ্গে কথা বলুন। এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।" বাবা এই বলেই ঘরে ঢুকে গেলেন। বিদেশীও সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল এবং পিছনে নুটুবাবু। বিশুবাবু ইতিমধ্যে পুলিশ নয় জেনে এগিয়ে এসে আমাদের ঘরের দরজায় দাঁড়ালেন।

বিদেশী বলল, "প্রসূন নাবালক, ও তো কনট্রাক্ট সই করতে পারবে না, ওর অভিভাবক হিসেবে আপনাকেই তা করতে হবে।"

"না। আমি ফুটবল খেলার কোন কিছুতে সই করব না। আমি ছেলের সর্বনাশ করে তার অভিশাপ কুড়োতে চাই না।"

নুটুদা ফিসফিস করে বিদেশীকে বলল, "অনিলবাবু একসময় ফুটবল খেলতেন। কলকাতার সব থেকে বড় টিম যুগের যাত্রীর দুর্ধর্ষ লেফট-ইন ছিলেন। তারপর রোভারস খেলতে গিয়ে বাঁ হাঁটুতে চোট লাগল, খেলা ছেড়ে দিলেন।"

"কে বলেছে খেলা ছেড়ে দিই?" বাবা হঠাৎ তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে বলে উঠলেন, "খেলা আমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। সেই ইনজুরির কোন চিকিৎসা হয়নি। আমার নিজের সাধ্য ছিল না, ক্লাবও ট্রিটমেণ্ট-এর জন্য একটা পয়সা দেয়নি। ছেঁড়া কারটিলেজ নিয়ে আজও আমি চলছি। ক্লাব আমাকে সেই চোট নিয়েই জোর করে খেলালো। আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে। খেলা ভাঙার তিন মিনিট আগে, তখনো গোল-লেস্। ওপেন নেট গোল আমার সামনে, তাজমহম্মদ মাটিতে, ব্যোমকেশ বোস ছুটে আসছে, ঘটক গোল ছেড়ে বেরোবে কিনা ঠিক করতে পারছে না, সারা মাঠ আকাশ কাঁপিয়ে গোলের জন্য চীৎকার করে উঠেছে, আর মাত্র ছ' গজ দূর থেকে আমি বাইরে মারলাম।"

উত্তেজিত হয়ে এত কথা বলে বাবা যেন লজ্জা পেলেন। মাথা নিচু করে বাঁ পা মেঝেতে ঘষড়ে ঘষড়ে তক্তপোশে গিয়ে বসলেন। তারপর ফ্যাকাশে হেসে মুখ তুলে বললেন, "আমি বলেছিলাম, পারব না, খেলতে পারব না। জোর করে আমায় খেলালো ইনজেকশান দিয়ে। বলেছিল, খেললে একটা চাকরি করে দেবে। আমি কিন্তু অনেক, সত্যিই অনেক চেষ্টা করেছিলাম গোলে মারতে।" বাবা চুপ করে যেতে যেতে অস্ফুটে বললেন,

"আমার সারা মুখে থুথু দিয়ে ওরা বলল, ঘুষ খেয়েছি। বাড়ি ফেরার সময় মেরে আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল।" বাবা অন্যমনস্কের মতো কপালের ঠিক মাঝে টিপের মতন কাটা দাগটায় আঙুল বোলালেন।

বিদেশী সহানুভূতির স্বরে বলল, "পৃথিবীর সব জায়গায়ই ফুটবলারদের এই ভাগ্যই হয়।"

"কেন হবে?" বাবা জ্বলজ্বলে চোখে প্রশ্ন করলেন। ভয়ঙ্কর রাগ আর ঘৃণা তাঁর চোখ থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে। "আমি যখন হাঁটু চেপে মাটিতে গড়িয়ে পড়লাম সবাই বলল, ভাণ করছি। ওরা একবার ভেবে দেখল না, যে লোকটা ছ' গজ থেকে শট নিতে পারল না, সে এতদিন ২৫-৩০ গজ থেকে অনায়াসে গোল করেছে, সে দু' বছর টপ স্কোরার হয়েছে লীগে! ওরা নিষ্ঠুরের মতো অপমান করল। অথচ শীল্ড উইনারের মেডেলের জন্য আমি কতদিন স্বপ্ন দেখেছি। আমার গোলে ক্লাব শীল্ড পাচ্ছে—"

বাবা চুপ করলেন।

"আমরা ভালো টাকা দেবো। প্রথম সীজন-এ মাসে যা দেবো, ভারতীয় মুদ্রায় তার মূল্য দু' হাজার টাকা। সেকেণ্ড টিমে আমরা এই রকমই দিই। খেলা দেখিয়ে ফার্স্ট টিমে এসে যদি ভাল খেলে তবে মাইনে, বোনাস, বিজ্ঞাপন থেকে রোজগার সব মিলিয়ে বছরে দু' লক্ষ টাকা তো পাবেই।"

তখন বিশুবাবু 'য়্যাঁ' বলে ঘরে ঢুকে এলেন। স্টুদা ফ্যালফ্যাল করে বিদেশীর মুখের দিকে তাকিয়ে, কথা বলতে পারছেন না। দরজার বাইরে ভীড়টা সরব হয়ে উঠল।

"প্রসূনের এত এলেম, য়্যা, ছোঁড়াটাকে দেখে তো কিছু বোঝা যায় না!" বিশুবাবু বললেন।

বাবা অরুণা গ্লাস ফ্যাকটরিতে টাইম-কীপারের কাজ করেন, তিন মাসের ওপর লক আউট চলছে। পঁয়ত্রিশ টাকা ঘর ভাড়া কিন্তু

বাবা একমাসের জন্যও বাকি ফেলেননি। অসম্ভব আত্মসম্মানবোধ। বাড়িওয়ালা অপমান করবে এটা তার কাছে অসহ্য ব্যাপার। মা'র কাছে শুনেছি একটা ওষুধের দোকানে কাজ করেন। প্রতিদিন দুপুরে বাবা কাজে বেরিয়ে যান। ফেরেন অনেক রাতে, তখন আমি ঘুমিয়ে থাকি।

"আপনি প্রসূনের সঙ্গেই কথা বলুন। গত কুড়ি বছর আমি ফুটবল মাঠে যাইনি। খবরের কাগজে খেলার পাতা পড়ি না। আমি এ-ব্যাপারে হ্যাঁ বা না, কোন কথাই বলব না।"

"অনিলবাবু!" ন্টুদা চাপা স্বরে মিনতি করল, "লক্ষ টাকা পর্যন্ত রোজগার করবে প্রসূন। আপনি রাজার হালে থাকবেন।"

"ভাবা যায় না, য়্যাঁ, বলে লাথি মেরেই এত টাকা! লোকটা যা বলছে রাজী হয়ে যান মশাই, রাজী হয়ে যান।" বিশুবাবু বললেন।

"ফুটবলারের আত্মসম্মানবোধ আছে বিশুবাবু। আমি কোনোদিন প্রসূনকে ফুটবল খেলতে বলিনি। সে নিজের আগ্রহে খেলে। আমি কোনোদিন তার খেলা দেখিনি। ফুটবল সম্পর্কে কোন কথা আমি শুনতে চাই না। আমার যা বলার বলে দিয়েছি।"

বিদেশী অনেক কথা বাবাকে বলল। বাবা শুধু ঘাড় হেঁট করে একগুঁয়ের মতো মাথা নেড়ে গেলেন। ন্টুদা, বিশুবাবু বাবাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশেষে বিদেশী একটা কার্ড বাবার হাতে দিয়ে বলল, "এতে আমার ঠিকানা লেখা আছে। আপনি চিন্তা করুন। তারপর আমাকে চিঠি দেবেন। পেলে রিটায়ার করবে শিগ্গিরী! আমরা সেই জায়গায় প্রসূনকে খেলাবো বলে এখনই ওকে তৈরী করে নিতে চাই।"

বিদেশী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার সঙ্গে সবাই। ফাঁকা ঘরে বাবা একা বসে। হাতে কার্ডটা। তারপর উঠে জানলায় এলেন। কার্ডটা কুচিকুচি করে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিলেন উঠোনে। একরাশ শিউলি ফুলের মতো কুচিগুলো ছড়িয়ে পড়ল।

মা রান্নাঘর থেকে ছুটে গিয়ে কার্ড-এর টুকরোগুলো কুড়োতে শুরু করলেন, তার পিছনে নীলিমা। কুড়োতে কুড়োতে নীলিমা আমার ঘরের জানলার কাছে এসে ফিসফিস করে ডাকল, "প্রসূন, এই প্রসূন! ওঠো, ওঠো, পাঁচটা যে বাজে।"

॥ ২ ॥

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। জানলায় তাকিয়ে দেখি নীলিমা। ও বলল, "ডেকে দিতে বলেছিলে না?"

আমাদের ঘড়ি নেই। নীলিমাকে কাল রাতে বলে রেখেছিলাম ভোর পাঁচটায় ডেকে দিতে। ওর স্কুল সকালে। খুব ভোরে উঠে জল তুলে, উনুন ধরিয়ে বাবার জন্য ভাত রেঁধে ও স্কুলে যায়। আজ সকালে শোভাবাজার ইউনিয়নের মাঠে আমি, নিমাই আর আনোয়ার ট্রায়াল দিতে যাব। হর্ষদা ইউনিয়নের কোচ বিপিন সিংহকে বলে রেখেছেন।

বিছানায় কিছুক্ষণ বসে স্বপ্নের কথা ভাবলাম। ভাবতে ভাবতে লজ্জা পেলাম। এরকম অবাস্তব উদ্ভট স্বপ্ন যে কেন দেখতে গেলাম ভেবে অবাক লাগল। তবে স্বপ্নে অবাস্তব অকল্পনীয় ব্যাপারই ঘটে। পোরতুগীজভাষী ব্রাজিলের লোক কিনা বাংলায় কথা বলছে! এমন না হলে আর স্বপ্ন বলা হয় কেন! কিন্তু শুনেছি অকারণে কেউ স্বপ্ন দেখে না; কোন না কোন সময়ে যা ভাবি বা মনে মনে পেতে বা হতে ইচ্ছে করে সেটাই স্বপ্ন হয়ে ফুটে ওঠে।

তাহলে আমি কি পেলে হতে চাই? উফ্ কী সাহস আমার! 'পে-এ-লে।' নামটা খুব নরম স্বরে ফিসফিসিয়ে বার কয়েক উচ্চারণ করলাম। ওর গল্প হর্ষদার কাছে বহুবার শুনেছি। হর্ষদা ভীষণ বই পড়েন আর খেলা দেখেন, জীবনে কখনো ফুটবল

খেলেননি। আগে আমাদের পাড়ায় থাকতেন। ছোটবেলা থেকে আমায় চেনেন। হর্ষদাই প্রথম আমায় বলেন—প্রসূন, তোমার মধ্যে ফুটবল খেলা আছে, মন দিয়ে খেলো, বড় হতে পারবে। কিন্তু পেলে হবার ইচ্ছাটা কখন যে মনের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে সেটা তো একদমই টের পাইনি। আমার ডান পায়ে প্রচণ্ড শট, কিন্তু বাঁ পা ভালো চলে না, বল নিখুঁতভাবে ট্র্যাপ করতে পারি না, হেড করার সময় চোখ বুঁজে কুঁকড়ে যাই। সবাই বলে বটে আমি খুব স্পিডি আর ভালো ড্রিব্‌লও করতে পারি, কিন্তু সত্তর মিনিট খেলার দম আমার নেই। কখন ফাঁকা জমিতে গিয়ে বলের জন্য অপেক্ষা করব তাও জানি না।

আরও অনেক ঘাটতি আমার আছে অথচ আমি কিনা পেলে-র জায়গায় খেলার স্বপ্ন দেখছি। আমি যে আস্ত গাড়োল, তাতে সন্দেহ নেই। নিজের উপর খানিকটা রাগও হতে লাগল। স্বপ্নের কথা যদি নিমাইটা শোনে তাহলে আমায় নিয়ে হাসাহাসি তো করবেই। ছু'লক্ষ টাকা বছরে! রীতিমত মাথা খারাপ হলে তবেই এত টাকার কথা কল্পনা করা যায়।

কালও ছুপুরে আমরা ছ'খানার বেশি রুটি কেউ খাইনি, রাত্রে চারখানা। নাড়িভুঁড়ি জ্বলে যাচ্ছিল, তবু রাত্রে পুতুল আর পিণ্টুকে আমার থেকে একখানা ছিঁড়ে ছু'ভাগ করে দিয়েছি। মাকে বলে রেখেছিলাম, আমার জন্য আজ সকালে ছু'খানা রুটি যেন রেখে দেয়। আজ ট্রায়ালের দিন। একদম খালি পেটে মাঠে নামতে ভরসা হচ্ছে না, যদি ব্যথা খিমচে ধরে! মাকে অবশ্য ট্রায়ালের কথা বলেছি, আর জানে নীলিমাও।

আমার ঘরটা স্যাঁতসেঁতে আর ছুপুরেও মনে হয় যেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। অর্ধেক দেয়ালের বালি খসে গেছে, কড়িকাঠে উই, একমাত্র জানলাটার ছুটো কপাটেরই কবজা ভাঙা। বৃষ্টি হলে বেশ অসুবিধা হয়। এই ঘরটাকে পুরো-ঘর কোনভাবেই বলা যায় না। লম্বায় আট ফুট, চওড়ায় পাঁচ ফুট। আমি একা

থাকি। একটা টুলও রাখার জায়গা নেই। দেয়ালে তাক আছে। আমার স্কুলের কয়েকটা বই সেখানে পড়ে আছে। দুটো প্যান্ট আর জামা দড়িতে ঝুলছে।

মা ঘরে ঢুকলেন। আমার মা'র মতন মা পৃথিবীতে আর দুটি আছে কিনা জানি না। আমাদের এত কষ্টের সংসার, মাঝে মাঝে মাথা খারাপ হয়ে যায় ক্ষিধেয়, গরমে অপমানে আর হতাশায়। মা'র কিন্তু সব সময় হাসিমুখ। কম কথা বলেন। মিষ্টি মৃদু স্বর শুনলে মনে হয় দুঃখ বলে কোন জিনিস পৃথিবীতে নেই। মা ঘরে ঢুকেই বললেন, "খোকা উঠে পড়েছিস! এখুনি বেরোবি?"

"হ্যাঁ। বাবা উঠেছে?" আমি ঘর থেকে বেরোবার সময় বললাম।

"না, গাটা কেমন গরম-গরম, জ্বর আসবে বোধহয়। তোর জন্য রুটি রেখেছি।"

মা আমায় চারখানা রুটি দিলেন। আমার বরাবরই মনে হয়, সকলেয় থেকে মা আমাকেই বেশি ভালবাসেন। রাত্রে নিশ্চয় না খেয়ে আমার জন্য রুটি রেখে দিয়েছেন। অন্য সময় এই নিয়ে রাগারাগি শুরু করে দিতাম, আজ করলাম না। সাতটার মধ্যে মাঠে পৌঁছতে হবে। নিমাই আর আনোয়ার বটতলা বাস স্টপে আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে।

বেরোবার সময় মাকে হঠাৎ প্রণাম করলাম। ফার্স্ট ডিভিশন ক্লাবে খেলতে যাচ্ছি না, ট্রায়াল দিতে যাচ্ছি মাত্র। যদি বিপিন সিংহের পছন্দ হয়, তাহলে ময়দানের ঘেরা মাঠে খেলার সুযোগ আসবে। ফুটবল আমার কাছে রূপকথার একটা প্রাসাদ। যে আশা মনে মনে বহুদিন ধরে লালন করে আসছি, আজ তার দরজায় পৌঁছতে যাচ্ছি মাত্র। যদি ঢুকতে পারি তাহলে এক-একটা তলা নীচে ফেলে উপরতলায় উঠবই, উঠতেই হবে। সে জন্য যত পরিশ্রম করা দরকার, করবই। মা আমাকে বুকে চেপে

ধরে কপালে ঠোঁট ছোঁয়ালেন। তারপর বললেন, "খোকা, মন দিয়ে চেষ্টা করবি।"

॥ ৩ ॥

কিট ব্যাগটা হাতে নিয়ে হনহনিয়ে যখন বটতলার দিকে যাচ্ছি, তখন মনের মধ্যে মা'র কথাটাই গুণগুণ করছিল। মন দিয়ে কেন, প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করব, মা সারা জীবন কষ্টে কাটিয়েছেন, ওকে সুখী করবই। ফুটবলাররা চাকরি পায়, ক্লাব থেকে টাকাও পায়। আমি জানি শোভাবাজার ইউনিয়ন টাকা দেবে না, দেবার সামর্থ্যও নেই। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল বা যুগের যাত্রীতে আমাকে যেতেই হবে। যাবার প্রথম ধাপ শোভাবাজার। এক কি ছু'বছরের মধ্যে চোখে পড়াতেই হবে আমার খেলা। খেলা দেখিয়েই বড় ক্লাবে যেতে চাই, তারপর একদিন ইনডিয়ার জারসিও পরব। টাকা আর খ্যাতি ছুটোই আমার চাই, তবে এখন দরকার শেষেরটা।

নিমাই আর আনোয়ার বটতলায় দাঁড়িয়ে। আমি পৌছনো মাত্র আনোয়ার হাতঘড়িতে সময় দেখে বলল, "সাড়ে ছ'টার মধ্যেই পোঁছে যাব।"

আমরা তিনজনেই যে উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনার শিকার হয়েছি সেটা বোঝা গেল, কেউ আমরা কথা বলতে চাইলাম না। সব থেকে বেশি কথা বলে নিমাই। লোকের পিছনে লাগতে কিংবা কারুর ভঙ্গি বা গলার স্বর নকল করে হাসাতে নিমাই ওস্তাদ। আমাদের বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে শান্তিপল্লী নামে এক জবরদখল কলোনীতে থাকে। বাবা নেই, দাদার কাপড়ের দোকান আছে হাতিবাগানে। নিমাই ক্লাস ফাইভে ফেল করার পর আর স্কুলে যায়নি।

বন্ধুদের মধ্যে অবস্থা ভালো আনোয়ারের। টকটকে রঙ, ছ' ফুট লম্বা, ওজন ৬৫ কেজি। একটা হোটেল আর দুটো বস্তির মালিক ওর বাবা। ধীর শান্ত প্রকৃতির আনোয়ারের খেলা তার ব্যবহার এবং জামা-প্যান্টের মতন পরিচ্ছন্ন। এখন পার্ট ওয়ান কমার্স-এর ছাত্র। আমার এবং নিমাইয়ের থেকে বছর তিনেকের বড়। আনোয়ার সঙ্গে থাকলে আমাদের পকেট থেকে একটা পয়সাও বার করতে হয় না। বলা বাহুল্য ওকে ছাড়া আমরা সিকি মাইলও চলি না।

বাসে আমরা শ্যামবাজার পর্যন্ত কেউ একটাও কথা বললাম না। আমার একবার শুধু মনে হয়েছিল, বাবাকেও প্রণাম করলে হতো। কিন্তু মনের কোথায় যেন একটা চাপা অভিমান বাবার সম্পর্কে রয়ে গেছে। একদিনও আমাকে খেলার বিষয়ে একটা কথাও বলেননি, একবারও খোঁজ নেননি আমি কেমন খেলছি, আমার খেলা দেখতেও যাননি কখনো। ফুটবল সম্পর্কে বাবার তীব্র ঘৃণা আমি ওর ঔদাসীন্যের মধ্য দিয়েই বুঝতে পারি। মা মাঝে মাঝে বলতেন, 'তোর বাবার কাছ থেকে জেনেটেনে নিস্ না!' তারপর বলতেন, 'থাক্‌গে।' একবার শুধু কানে এসেছিল, মা'র কী একটা কথার জবাবে বাবা বললেন, "ফুটবল আমাকে ফোঁপরা করে দিয়েছে, খোকাকেও দেবে। ওকে বারণ করো।'

শ্যামবাজার থেকে বাস বদল করে এসপ্লানেডে নামলাম ঠিক সওয়া ছটায়। শোভাবাজার টেন্ট-এ পৌঁছে দেখি জনা বারো ছেলে ড্রেস করায় ব্যস্ত। একজনকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, "বিপিনদা আসবে সাতটায়। আমরা এখন রেড রোড দিয়ে সোজা গিয়ে ট্রাম লাইন পেরিয়ে, প্যারেড গ্রাউণ্ডটাকে চক্কোর দেবো। ফিরে এসে দেখব বিপিনদা অপেক্ষা করছে।"

ভেবে পেলাম না, এখন আমরা তিনজন কী করব। আনোয়ারই বলল, "বসে থেকে কী করব, চল ওদের সঙ্গে দৌড়োই।

বিপিনদা তাতে ইমপ্রেশড হবে।”

আমরাও ড্রেস করে ওদের সঙ্গে দৌড়ে যোগ দিলাম। মিনিট পাঁচেক দৌড়বার পর, ওরা প্যারেড গ্রাউণ্ড-এর দিকে না ঘুরে বাঁ দিকে এসপ্লানেডমুখো হল। তারপর ময়দান হকার্স মারকেট-এ ঢুকে টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে জামায়, মুখে, পায়ে ছিটিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল।

“দাঁড়িয়ে দেখছো কী, গায়ে জল লাগাও। ঘামে জবজব না করলে বিপিনদা খুশি হবে না, আবার ছোটাবে। এবার এখান থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে সোজা টেণ্ট-এ।” ওদের মধ্যে সব থেকে বয়স্ক যে, আমাদের লক্ষ্য করে বলল।

“খবরদার, বিপিনদাকে এসব বলবে না। যদি ফাঁস করো তাহলে”—গাঁট্টাগোট্টা একজন ভয়ঙ্কর চোখে আমাদের তিনজনের দিকে তাকাল।

আমরা কোন প্রশ্ন না করে ওদের মতন গায়ে, মাথায় জল দিয়ে ‘ঘাম-জবজবে’ হয়ে নিলাম। যেহেতু নতুন, তাই একজন অনুগ্রহ করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল, “রোজ রোজ এতখানি করে একঘেঁয়ে দৌড় কি ভালো লাগে? দৌড়ের পরই পার্টি করে খেলা, তারপর পাতলা দু’ পীস্ রুটি আর একটা ডিম। একমাসেই তো টি-বি ধরে যাবে! তাই খাটুনি কমাবার জন্যই এসব করি। বিপিনদা জানতে পারলে কিন্তু রক্ষে নেই, মাঠে দাঁড়িয়ে চোখের সামনে কুড়ি পাক দৌড় করাবে।” এই বলে সে হাসতে শুরু করল।

“আমরা তো আর চ্যামপিয়নশিপ ফাইট করতে যাব না, নেমেও যাব না, এখন তো রেলিগেশন প্রমোশন বন্ধ। তবে এত দৌড়োবার দরকারটা কী? অফিসের খেলা আছে, খেপের খেলা আছে, এত ধকল কি সামলানো যায়?” আর একজন এই বলে আমাদের যাবতীয় কৌতূহল মিটিয়ে দিল।

প্রথম দিনেই এই রকম রূঢ় ধাক্কায় গড়ের মাঠ সম্পর্কে

মোহভঙ্গ হবে আশা করিনি। আমাদের টগবগে উৎসাহ এইখানেই খানিকটা থিতিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর 'এইবার চল রে' বলে ওরা টেন্ট-এর দিকে আবার দৌড় শুরু করল। আমরাও ওদের পিছু নিলাম।

বেঁটে, টাকমাথা এক প্রৌঢ় মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে। পায়ের কাছে গুটি চারেক বল। হাফ প্যান্টটা হাঁটুর নিচে ঢলঢল করছে। ভুঁড়ি দেখে মনে হয় গেঞ্জির নিচে আর একটি বল রয়েছে। আমরা দৌড়ে এসে ওকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়ালাম। একজন পেটে হাত দিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁফাতে লাগল, একজন শুয়ে পড়ল, আর একজন বলল, "বিপিনদা যা খাটান, উফ্ আর পারা যায় না! এবার আমরা মরে যাব।"

বিপিনদার মুখ খুশিতে ঝকমক করে উঠল। কিন্তু যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে বললেন, "কষ্ট না করলে কি কেষ্ট মেলে? বড় প্লেয়ার কি অমনি-অমনি হওয়া যায়? তোদের আর কি খাটাচ্ছি, আমরা খেলার দিন আড়াইশো ডন, পাঁচশো বৈঠক আর মাঠে চল্লিশ পাক দিয়ে গুণে গুণে একশো শট মেরে দু' সের দুধ আর আধ সের বাদাম খেয়ে বাবুঘাটে চলে যেতুম। গঙ্গামাটি মেখে দু' ঘণ্টা বসে থাকতুম। দুপুরে পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়ে মাঠে নামতুম।"

আমার পিছনে দাঁড়ানো সেই গাঁট্টাগোট্টা ছেলেটি চাপা স্বরে বলল, "ফুটবল খেলতো না কুস্তি করতো?"

বিপিনদা বোধহয় আঁচ করতে পেরেছেন যে, কেউ একজন মন্তব্য করেছে। তিনি আন্দাজে আমার দিকে তাকালেন। আমি কাঁটা হয়ে গেলাম।

"ইয়েস, কী যেন বললে?"

আমি রীতিমত নারভাস হয়ে, কী বলব ভেবে পাচ্ছি না, তখন পিছন থেকে বলে উঠতে শুনলাম, "আমি বলছিলুম যে বিপিনদাদের সময়ে মিলিটারিদের সঙ্গে খেলতে হতো কিনা

তাই ট্রেনিং, খাওয়া-দাওয়া ছিল মিলিটারি ধরনের। তাই শুনে এ বলল, ওইভাবে কুস্তি হয়, ফুটবল খেলা যায় না।"

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখি গাঁট্টাগোট্টার তর্জনী আমার দিকে তোলা এবং মুখটি নির্বিকার সারল্যে ভরা। অনেকে মুখ টিপে হাসছে। আনোয়ার হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "বাজে কথা, প্রসূন আগাগোড়া চুপ করে আছে। কুস্তির কথা তুমিই বলেছ, আমি পরিষ্কার শুনেছি।"

"কে বলেছে আমি বলেছি?" গাঁট্টাগোট্টা তেরিয়া হয়ে এক পা এগিয়ে এসেই কী ভেবে থমকে গেল। আনোয়ার তার হাফ পাউণ্ড পাঁউরুটির মতো বাইসেপ দুটো একবার শক্ত করেই আলগা করে দিল। বিপিনদা কিন্তু বেশ খুশী হয়েই বললেন, "কারেক্ট, কারেক্ট, ফুটবল খেলতে হলে কুস্তির কিছু কিছু প্যাঁচ জানা দরকার, বিশেষ করে লেঙ্গি মারা।" তারপর আমাদের তিনজনের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা হর্ষর কাছ থেকে এসেছ?"

আমরা ঘাড় নাড়লাম। উনি আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বললেন, "যাও, ওধারে গিয়ে শট করো। কতদূর মারতে পারো, দেখি।"

॥ ৪ ॥

যাক, কিছু একটা দেখাবার মতো কাজ প্রথম দিনে পাওয়া গেল! আমি আর নিমাই একদিকে আর ৬০।৬৫ গজ দূরে আনোয়ার। আনোয়ারের শটের জোর প্রচণ্ড। আনোয়ারের পেনালটি শট আটকাতে গিয়ে এক গোলকীপারের কবজি ভেঙে যায়। শুনেছি শৈলেন মান্নার শটে খুব জোর ছিল। আমি জোর দেখাবার বদলে কেরামতি দেখাতে লাগলাম। আউট সুইং করালাম, চীপ করলাম, ভলি আর সিজারিয়ান মারলাম, দু-চারবার বাইসাইকেল কিক করার চেষ্টা করলাম, হল না। পেলের ছবি দেখে এটা নকল করার চেষ্টা করেছিলাম। পরে অবশ্য বুঝি, রীতিমত জিমন্যাসটিকস্ না জানলে এই শট মারা যায় না। একজন দেখিয়ে দেবার লোকও চাই।

আনোয়ার বিরাট বিরাট শট করে যাচ্ছে। নিমাই কুড়িয়ে আনছে আর গাঁইগুঁই করছে, "আমি যেন চাকর। কিছু হবে না…শুধু শট করতেই জানে…আমরা বাদ পড়ে যাব প্রসূন, বুঝলি!…আনোয়ারটার স্কিল বলতে তো ঘণ্টা, বিপিনদাকে বল না এবার একটু ট্র্যাপিং, হেডিং, ড্রিবলিং করে দেখাই।"

বিপিনদা অন্য ছেলেদের দিয়ে একই জিনিস করছিলেন, লম্বা লম্বা শট। ওর কাছে গিয়ে বললাম, "বিপিনদা, এবার একটু স্কিল প্র্যাকটিস করব?"

"স্কিল!" মনে হল বিপিনদা শব্দটা প্রথটা শুনলেন। "স্কিল? কী করবে তা দিয়ে?"

মাথা চুলকে বললাম, "মানে, খেলতে গেলে স্কিল ছাড়া তো খেলা যাবে না।"

"শোভাবাজার ইউনিয়নে স্কিল?" বিপিনদার মুখ এমন হয়ে উঠল যেন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে কাউকে জুতো পায়ে ঢুকতে দেখছেন। "আঠাশটা ম্যাচ খেলে আমরা গতবার সাত পয়েন্ট পেয়েছি, তার আগের বছর পেয়েছিলাম পাঁচ পয়েন্ট। লীগের ওঠা-নামা ছিল না তাই রক্ষে। স্কিল লাগে যারা চ্যামপিয়নশিপ ফাইট করে—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, যুগের যাত্রী এদের। আমরা ফাইট করি রেলিগেশন, নেমে যাওয়া আটকাতে। স্কিল দিয়ে আমাদের কী দরকার?"

"তাহলে এই যে লম্বা লম্বা কিক প্র্যাকটিস করাচ্ছেন!" আমি অতি বিনীতভাবেই তর্ক করার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করলাম।

বিপিনদা এক গাল হেসে বললেন, "এই হচ্ছে পদ্ধতি, আমার পদ্ধতি। প্রেশারের মধ্যে সব ম্যাচ আমাদের খেলতে হবে। অপোনেন্ট-এর ন'জন আগাগোড়া আমাদের পেনালটি বক্স-এ থাকবে, তখন কী করবে?"

"ক্লিয়ার করব।"

"গুড! গুড! তোমার দেখছি ব্রেন আছে। কিন্তু কী-ভাবে ক্লিয়ার করবে?"

"কিক করে।"

"ভেএএরি গুড!" সেই জন্যই এই লং কিকিং প্র্যাকটিস। এই একটা স্কিলই আমাদের বেশি কাজে লাগে। এরপর গোটা দুয়েক ট্যাকলিং শেখাবো, যাও মন দিয়ে এখন বল মারো। তোমার সঙ্গে এসেছে ওই যে ছেলেটা, নাম কী?" বিপিনদা আঙুল তুললেন আনোয়ারের দিকে। নামটা শুনে বললেন, "গুড প্লেয়ার, স্টপারে ভাল মানাবে।"

বুঝলাম আনোয়ারের চান্স হয়ে গেল। তাতে ভালোই লাগল। আমার পোজিশান হল স্ট্রাইকার, আনোয়ার আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

নিমাইয়ের কাছে গিয়ে বিপিনদার সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে

বললাম। শুনে নিমাই বলল, "আমি মোটেই ঘাবড়াচ্ছি না। লেঙ্গি মারার কায়দা দেখিয়ে চান্স করে নেবো। তুই বরং নিজের জন্য ভাব।"

আমি মনে মনে বেশ দমে গেছি। ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবলের সঙ্গে এইভাবে পরিচয় হবে ভাবিনি। ফুটবলের সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো জানব, চর্চা করব, তারিফ পাবো, অনেক উঁচুতে উঠব, এই সব যা ভাবতাম বিপিনদা তা চুরমার করে দিলেন। আমি গুটিগুটি মাঠের বাইরে এসে বসে পড়লাম। কেউ আমাকে লক্ষ্য করল না। চারটে বল নিয়ে মাঠে এখন প্র্যাকটিস হচ্ছে হেডিংয়ের। একজন পর পর কর্ণার কিক্ করে যাচ্ছে, গোলের মুখে দশ-বারোজন হেড করে বল বের করে দিচ্ছে। ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, হাসাহাসি, গালিগালাজ করছে। একবার হেড করার জন্য সবাই লাফাল, তারপরই একজন নাক চেপে মাঠ থেকে বেরিয়ে এল। কনুই দিয়ে কেউ মেরেছে। আর একবার, গোলকীপার লাফিয়ে উঠে বল-এ হাত দিয়েও ধরল না। কে তার প্যান্টটা এমন জায়গায় টেনে নামিয়ে দিয়েছে যে গোলের থেকে লজ্জা বাঁচানোটাই সে জরুরী কাজ গণ্য করতে বাধ্য হয়েছে।

নাকে ভিজে রুমাল চেপে সেই ছেলেটি আমার কাছে এসে দাঁড়াল। ডিগডিগে রোগা, বয়সে আমার থেকে বছর ছয়-সাতের বড় হবে। চোখাচোখি হতেই বলল, "কোন্ পজিশানের?"

বললাম, "স্ট্রাইকার।"

"কোথা থেকে?"

"পাড়ার ক্লাব। এই প্রথম গড়ের মাঠে।"

আনোয়ার হঠাৎ তলপেটে হাত চেপে কুঁজো হয়ে গেল। কেউ হাঁটু দিয়ে মেরেছে। ও অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সামলে উঠল। লক্ষ্য করলাম, গাঁট্টাগোট্টার দিকে আনোয়ার হিংস্র চোখে তাকাচ্ছে। আমি আঙুল তুলে ছেলেটিকে বললাম, "আচ্ছা,

ওই বেঁটেটার নাম কী ?"

"পলাশ টিকাদার। ডেনজারাস ছেলে। গত বছর রেফারীকে চড় মেরেছিল, একজনের পা ভেঙে দিয়েছে, টাকা খেয়ে সেমসাইড গোল করে ম্যাচ হারিয়েছে, টেন্ট থেকে একবার চারটে টেরিলিন ফুলপ্যান্ট একসঙ্গে চুরি করেছে। আমরা ওর থেকে দূরে দূরে থাকি।"

"আপনার নাকে মারল কে ? পলাশ ?"

"না, রবি। ছেলেটা ভালো। বিপিনদার ইনস্ট্রাকশন, কী আর করবে।"

লক্ষ্য করলাম, পলাশ আনোয়ারের থেকে দূরে দূরে রয়েছে। আনোয়ার যতবার ওর পাশে আসছে, ও সরে যাচ্ছে। নিমাই ভীড় থেকে তফাতে।

"আপনি শোভাবাজারে ক' বছর ?" আমি কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলাম।

"পাঁচ বছর হবে।"

"ক্লাব বদলাবেন না ?"

ওর মুখ ম্লান হয়ে গেল। রক্তমাখা রুমালটা চোখের সামনে অনেকক্ষণ ধরে থেকে বলল, "বিপিনদা একটা দোকানে কাজ জোগাড় করে দেবে বলেছে।" তারপর রুমালটা মুঠোয় ভরে, "এইবার নামি" বলে মাঠের দিকে এগিয়ে গেল।

হেডিং প্র্যাকটিস শেষ হয়ে গেছে। এইবার বোধহয় পার্টি করে খেলা হবে। আমি পা থেকে বুট খুলতে শুরু করলাম।

ফেরার সময়ও আমার মতোই কেউ বিশেষ কথা বললাম না। নিমাই একবার বলেছিল, "মাঠ থেকে উঠে গেলি কেন ? এসব ক্লাবে অত মেজাজ চলে না।" আর একবার বলেছিল, "পলাশটা মরবে। আনোয়ারকে যা ক্ষেপিয়েছে !"

বাড়িতে মা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কী হল ?" মন ভাল ছিল না। দায়সারা জবাব দিলাম, "প্র্যাকটিস হল খানিকটা,

দম করার জন্য দৌড়লুম কিছুক্ষণ। প্রথম প্রথম এই সবই চলবে।”

নীলিমা কোন প্রশ্ন করেনি, তাতে হাঁফ ছেড়েছি। ওর কাছে ফার্স্ট ডিভিশন সম্পর্কে বলে বলে আমি এমন একটা ধারণা করিয়ে দিয়েছি, ময়দানের ঘেরা মাঠ তিনটে যেন দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট আর ঠনঠনের কালীমন্দির ; সেই ধারণাটা প্রথম দিনেই ভেঙে দিলে হয়তো ওর চোখে আমি নেমে যাব।

॥ ৫ ॥

সন্ধ্যায় হর্ষদার বাড়ি গেলাম। সব শুনে বললেন, “আরে, বিপিন সিংহী যা করতে বলে করে যাবি, যা গল্প বলবে শুনে যাবি। ওর কাছে তো খেলা শেখার জন্য তুই যাসনি। গেছিস একটা ফার্স্ট ডিভিশন টিমে ঢুকে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, এরিয়ান কি যুগের যাত্রীর চোখে পড়তে। সে জন্য একটা ক্লাব তো দরকার। শোভাবাজার না হলে তোর মতো অজানা অনামী একটা জুনিয়ারকে চান্স্ দেবে কে? স্পোরটিং ইউনিয়ন কি জর্জ টেলিগ্রাফে গেলেও তো পাত্তা পাবি না।”

“চান্স পাবার থেকেও আমি আগে খেলা শিখতে চাই।”

“ম্যাচ খেলাটাও শেখার পক্ষে দরকারী ব্যাপার। এ-বছরটা একটু নাম কর, পরের বছর এরিয়ান কি ভ্রাতৃসঙ্ঘে চেষ্টা করব। বয়স কম রয়েছে, ছোট ক্লাবে দু-তিন বছর থেকে এক্সপিরিয়ান্স তৈরি হলে বরং সুবিধেই হবে বড় ক্লাবে।”

হর্ষদার সঙ্গে তর্ক করা যায় না। একটা না একটা যুক্তি খাড়া করে চুপ করিয়ে দেবেই। ওকে আমার বলতে ইচ্ছে করছিল— দু-তিন বছরই বা নষ্ট করব কেন ছোট ক্লাবে পড়ে থেকে? আমি এখুনি মোহনবাগানে খেলতে চাই। আমার ফেভারিট টিম

মোহনবাগান, আমার স্কুলের পুরনো খাতায় খবরের কাগজ থেকে কেটে চুণী গোস্বামীর ছবি পাতার পর পাতায় সেঁটে রেখেছি। মোহনবাগান টেন্টটাকে দূর থেকে তাজমহল ছাড়া আর কিছু ভাবি না।

গোঁড়া ইস্টবেঙ্গলী নিমাই একবার বলেছিল, ওর স্বপ্ন মোহনবাগানের এগেনস্টে হ্যাটট্রিক করা। সেদিন থেকে ওর সম্পর্কে এক টুকরো ঘৃণা মনের মধ্যে জমাট বেঁধেছে। বহু সময় সেটাই নিমাইয়ের বিরুদ্ধে আমার রাগে ফেটে পড়ার কারণ হয়। পরে অবশ্য লজ্জা পাই, কেননা আমায় রাগতে দেখলে নিমাই চুপ করে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকে। তারপর বলে, "তোর বড্ড মেজাজ। ভীষণ অধৈর্য তুই।"

আমি জানি ধৈর্য ধরার মতো মন আমার নেই। সেটা আনোয়ারের আছে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় ও খেলে। অতবড় দেহটা বেড়ালের মতো নাড়াচাড়া করায়। ট্যাকল করে বাঘের মতো রোখ নিয়ে অথচ পরিচ্ছন্নভাবে। কেউ ওকে ফাউল করলে, একবার শুধু তার দিকে তাকায়। সাধারণত তারপর আর ফাউল হয় না। সেই তুলনায় নিমাই মিনিটে একটা-দুটো ছোটখাট ফাউল করে যাবেই। বেশির ভাগই রেফারীর চোখের আড়ালে ঘটে। স্টপারটাকে কিছুতেই নড়ানো যাচ্ছে না, মাঝখানটা এঁটে ধরে আছে, অমনি নিমাই তার পিছনে লেগে গেল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে দেখা যাবে বল ছেড়ে সে নিমাইয়ের পিছু নিয়েছে রাগী মুখে। তারপর আমার কাজ ফাঁকা অঞ্চলটাকে ব্যবহার করা এবং সেটা করেও থাকি।

অসম্ভব ভালো থ্রু দিতে পারে নিমাই, আর বল সমেত টিঙটিঙে শরীরটাকে পাঁকাল মাছের মতো হড়কিয়ে নিয়ে যেতে পারে তিন-চারজন ডিফেণ্ডারের মধ্যে দিয়ে। ও জানে আমি কোথায় থাকব। বলটা ঠিক আমার পায়েই ছুটে আসে পোষা কুকুরের মতো। তখন একটা কাজই বাকী থাকে—হয় আলতো

করে, নয়তো প্রচণ্ড জোরে বলটাকে গোলের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া। অনেকে বলে, নিমাই না থাকলে আমি গোল করতে পারব না। শুনে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করি, রাগও হয়। কারুর উপর নির্ভর করে খেলছি, গোল দিচ্ছি, আমার কোনোই কৃতিত্ব নেই—এটা মানতে চাই না। নিমাইকে আমি সত্যিই ঘৃণা করি। কিন্তু ও তা জানে না। ও আমাকে ভালবাসে।

৪

শোভাবাজার ইউনিয়নে আমি প্রথম ১৬ জনের মধ্যে রয়ে গেলাম। আনোয়ার আর নিমাই ফার্স্ট টিমে পর পর সাতটা লীগ ম্যাচে খেলল। সাতটাই আমরা হারলাম। ইস্টবেঙ্গল দিল পাঁচ গোল, ইস্টার্ণ রেল চার, কালীঘাট দুই, মহমেডান চার, এরিয়ান পাঁচ, স্পোরটিং ইউনিয়ন দুই, বি-এন-আর তিন। আমরা একটাও গোল দিতে পারিনি।

আনোয়ার সাতটা ম্যাচই পুরো খেলেছে। বিপিনদার অত্যন্ত ফেভারিট হয়ে উঠেছে ও। সাতটা খেলায় শোভাবাজার ২৫ গোল খেয়েছে। আমার ধারণা স্টপারে আনোয়ার না থাকলে সংখ্যাটা ৫০ হতো। প্রমিসিং হিসেবে ওর বেশ নাম হয়ে গেছে এই ক'টা খেলাতেই। নিমাই দুটো ম্যাচ পুরো খেলেছে, বাকিগুলোয় আধা আর সিকি।

নিমাইয়ের জন্য কষ্ট হচ্ছে আমার। দুজন-তিনজনকে কাটিয়ে গোলের মুখে অভ্যাসমত বল ঠেলে দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দ্যাখে কেউ নেই, ওদের ব্যাক কিংবা গোলকীপার বলটা ধরছে। নিমাই মাঠের চারধারে তাকায়। ওর খেলার ধরন একমাত্র যে বোঝে, সে তখন মাঠের বাইরে বেঞ্চ-এ ড্রেস করে বসে আছে। নিমাই যত গোল ওপেন করেছে তার শতকরা নব্বুইটা থেকে আমি স্কোর করতে পারতামই। দেখতে দেখতে চোখে জল এসে যায়। নিমাই অসহায়ের মতন আমার দিকে যখন তাকায়, মুখ

ঘুরিয়ে ফেলি।

আমি জানি ওরও আমার মতন অবস্থা। আমাকে খেলানো হচ্ছে না অথচ ও চান্স পাচ্ছে, তাইতেও ও মরমে মরে আছে। তার উপর নিজের যাবতীয় চেষ্টা বিফল হতে দেখে শেষের দিকে নিমাই আর গা লাগায় না। রাগে আমার সর্বাঙ্গ রী রী করে, যখন দেখি উইংগার কি আর এক ইনসাইড ভুল জায়গায় পাস দেওয়ার জন্য নিমাইকে দাঁত খিঁচোচ্ছে।

আমি আর আনোয়ার ওকে বলেছিলাম, তুই নিজেই গোল কর। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলায় নিমাই তিনবার শান্ত আর নঈমের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে সামনে থঙ্গরাজকে পেয়েও গোল করতে পারেনি। দু'বার বাইরে মারল, আর একবার হাতে তুলে দিল। "কী রকম যেন হয়ে গেলুম"—নিমাই পরে আমাকে বলে, "অতবড় একটা চেহারা দু' হাত মেলে এগিয়ে আসছে! ভয়ের চোটে তাড়াতাড়ি মেরে দিলুম।"

আমিও রেগেই জবাব দিলাম, "আর মিথ্যা কথা বলে সাফাই দিতে হবে না। যা বল পেয়েছিলি, তাতে গোলে ইয়াসিন থাকলেও গোল হয়। তুই বাঙাল তাই গোল করিসনি। আমি যদি মোহনবাগানকে এভাবে পেতুম, বলাই দে সুদ্ধু গোলে ঢুকিয়ে দিতুম।"

নিমাই একগাল হেসে বলল, "তারপর দু'দিন উপোস করে প্রায়শ্চিত্তি করতিস।" কিছুক্ষণ পর ও গলা নামিয়ে বলল, "খেলার পর যখন টেণ্টে ডেকে নিয়ে গেল জল খাওয়াবার জন্য, তখন পি. সিন্‌হা আমার নাম, কতদিন খেলছি, কোথায় থাকি জিজ্ঞাসা করল। কেন বল্ তো?"

"সামনের বছর পরিমল দেকে বিদেয় করে তোকে আনবে বলে।"

নিমাই অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেল। তারপর বেশ রেগেই বলল, "মোহনবাগানকে গুনে গুনে তিন গোল দেবো তাহলে।"

রাজস্থানের সঙ্গে খেলার আগের দিন নোটিশ বোর্ড-এ টিমের লিস্ট-এ আমার নাম উঠল। তিন দিন ধরে আকাশ মেঘলা। বৃষ্টিও হয়ে গেছে দুদিন। লিস্ট-এ এগারোজনের নামের মাথায় লেখা 'ইফ রেইন'। পাঁচজনের নামের পাশে পাঁচটি নাম, তাদের মাথায় লেখা 'ইফ নট রেইন'। আমার নাম 'ইফ নট রেইন'-এর তালিকায়। ব্যাপারটা একজন বুঝিয়ে দিল। বৃষ্টি পড়লে কারা খেলবে আর না পড়লে কারা খেলবে। আমার নামের পাশে টিকাদারের নাম। যদি বৃষ্টি পড়ে তাহলে আমি বাদ, টিকাদার খেলবে।

রাতে ঘুমোতে পারলাম না। ঘন ঘন জানলা দিয়ে আকাশ দেখতে লাগলাম। তারা দেখা যায় না, ঘোলাটে গঙ্গাজলের মতন আকাশ। কাল বিকেলে বৃষ্টি হবে কি হবে না, ঘেরা মাঠে প্রথম খেলার সুযোগ আসবে কি আসবে না, এই চিন্তা করতে করতে একটা ভয় ক্রমশ আমাকে পেয়ে বসল। কাল নির্ঘাৎ আমি ওপেন নেট মিস করবো। এরকম আগেও হয়েছে।

“ভাবছি। শরীরটা বড় ম্যাজম্যাজ করছে, গঙ্গায় সাঁতার কেটে ফিট না হলে খেলব না। সাঁতারের মতো এত ভালো ‘বডি ফিট’ করার আর কিছু তো হয় না।”

আমার বয়স তখন চোদ্দ। কথাগুলো শোনামাত্র ‘বডি ফিট’ করার জন্য আনচান করে উঠলাম।

“আমার এক্সপিরিয়ান্স থেকে যা বুঝেছি, বুঝলি নীলে, খেলার দিন কোন রকম প্র্যাকটিস নয়। সকালে শুধু সাঁতার আর দুপুরে রেস্ট—কষে ঘুম। বিকেলে অদ্ভুত ঝরঝরে হয়ে যায় শরীরটা, ব্রেনও খুব ভালো ফাংশন করে। ফরোয়ার্ডদের তো অবশ্যই সাঁতার কাটা দরকার। হ্যাঁ, তার আগে আচ্ছাসে তেল মেখে ডলাই-মলাই, মানে মাসাজ করে মাস্‌লগুলোকে আলগা করে নিতে পারলে তো কথাই নেই। গোষ্ঠ পাল, সামাদ থেকে শুরু করে পি-কে, চুণী সবাই ম্যাচের দিন সাঁতার কাটতো। ওরা রোম ওলিমপিক-এ হারল কেন জানিস ?”

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। মন্টেদা একটা সিগারেট ধরিয়ে সতরঞ্চিতে বাবু হয়ে বসলেন। আমাদের রাইট আউট, ইস্টার্ণ রেল-এ খেলে, খুব বইটই পড়ে। বলল, “হাঙ্গেরী টিমে অ্যালবারটো ছিল যে!”

“থাকলেই বা!”

“টিচি ছিল।”

“তাতে কী হয়েছে ?”

আমরা খুবই দমে গেলাম কারণটা খুঁজে না পেয়ে। মন্টেদা কষে সিগারেটে টান দিয়ে সতরঞ্চি উলটিয়ে মেঝেয় ছাই ঝেড়ে বললেন, “যেখানে ইনডিয়া টিমকে থাকতে দিয়েছিল, সেখানে সাঁতার কাটার মতো একটা চৌবাচ্চাও ছিল না। বডি ফিট করতে পারেনি ম্যাচের দিন। চুণী-প্রদীপ সারা সকাল অনেক খুঁজেছিল যদি একটা পুকুর কি ডোবাও পাওয়া যায়! পায়নি।”

আমি বললাম, “ম্যাচের দিন চুণী কি সাঁতার কাটে ?”

॥ ৬ ॥

চাতরায় একবার ফাইনাল খেলাতে নিয়ে গেছল পাইকপাড়া অগ্রগামী। সারারাত চিন্তা করেছিলাম অপোনেণ্ট ত্রিবেণী যুব সঙ্ঘের স্টপার আর দুটো ব্যাকের কথা। সেমি-ফাইনালে চারটে গোল দিয়ে মাঠ থেকে বেরোচ্ছি, তখন যে লোকটি আমায় বলেছিল, "খোকা, তুমি তো বেশ খ্যালো! কিন্তু তোমার বাঁ পা যে একদম চলে না!"

পরে শুনলাম তার নাম 'ল্যাটা মণ্টে'। ফাইনালে আমাদের অপোনেণ্ট স্টপার। বছর কুড়ি আগে কলকাতা মাঠে খুব নামকরা ফরোয়ার্ড ছিলেন এরিয়ান-এ। এখন মাঝে মাঝে খেলেন স্টপারে। ওর ভালো নামটা কেউ বলতে পারল না। ব্যাক দুটি ক'মাস আগেই জুনিয়ার ইনডিয়া টিমের সঙ্গে এশিয়ান ইয়ুথ চ্যামপিয়নশিপ খেলতে গেছল ব্যাংকক না সিওল-এ। ওদের সেমি-ফাইনালে খেলা দেখতে দেখতে পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "রাইট ব্যাকটার কী নাম, দাদা?"

"সুধীর কর্মকার। যে রকম খেলছে নাম করবে মনে হচ্ছে।"

ফাইনালের আগের রাতে ঘুমোতে পারিনি, শুধু মাথার মধ্যে অবিরাম গুণগুণ করেছে ল্যাটামণ্টের কথাটা, 'তোমার বাঁ পা যে একদম চলে না' আর চোখে ভেসেছে সুধীর কর্মকারের ট্যাকলিং। ফাইনালের দিন সকালে ল্যাটামণ্টে আমাদের ঘরে এলেন। ত্রিবেণী টিম পাশের ঘরেই কাল থেকে রয়েছে। আমাদের নীলেদা ওকে দেখেই খাতির করে বসিয়ে বলল, "মণ্টেদা, আজ খেলছেন তো?"

"নিশ্চয়! ওকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার, ওর অমন ডজ, অমন স্পিড, অমন ব্রেন হয় কী করে? সবই মা গঙ্গার কৃপায়। যে জলে কারেন্ট আছে, সেখানে সাঁতার কাটার উপকারিতা যে কী, তা তো জানো না? অরুণ ঘোষ এমন দারুণ খ্যালে কী করে? শিবপুরে বাড়ি, পা বাড়ালেই গঙ্গা।"

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে মণ্টেদা উঠলেন, "যাই, তেলটেল জোগাড় করিগে।"

নিমাই নেই। আনোয়ার আর আমাকে পাইকপাড়া অগ্রগামী খেলাতে এনেছে। আনোয়ারকে বললাম, "যাবি গঙ্গায়?" ও আঁতকে উঠল, "গঙ্গায়! আরে বাপ্‌স! চৌবাচ্চায় পর্যন্ত নামি না—সাঁতার জানি না বলে।"

কিন্তু ইস্টার্ণ-এর রাইট আউট আর স্পোরটিং ইউনিয়নের লেফট হাফব্যাক সরষের তেলের খোঁজে ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। আধ কিলো তেল নিয়ে আমরা চারজন চাতরার গঙ্গার ঘাটে বসে মণ্টেদার কথামত মাস্‌লগুলোকে আধ ঘণ্টা ধরে আলগা করে জলে যখন নামলাম, মণ্টেদা তখন ছোট্ট একটা তেলের বাটি হাতে ঘাটে এসে বসলেন। বেশ আরামে সাঁতার কাটা শুরু করলাম।

মণ্টেদা চীৎকার করে বললেন, "ঘাটের কাছে ফুরফুর করে মেয়েদের মতো সাঁতার! তোরা কি ফুটবলার না, লুডো প্লেয়ার?"

প্রবল বিক্রমে আমরা মাঝ গঙ্গার দিকে রওনা হয়ে গেলাম এবং আধ ঘণ্টা পরে যখন ফিরলাম তখন দম ফেলতে পারছি না। মণ্টেদা বাহুতে মালিশ করতে করতে বললেন, "এই তো, একেই বলে সাঁতার। এখন রেস্ট, জলে ফ্লোট করো এবার।"

অতঃপর আমরা চিত হয়ে জলে ভাসতে শুরু করলাম। মিনিট দশ পর পাড়ের দিকে তাকিয়ে চমকে গেলাম। ভাঁটার টানে চাতরাঘাট থেকে বহু দূরে চলে এসেছি। টানের বিরুদ্ধে সাঁতরে

ফিরে এসে ঘাটের সিঁড়িতেই আমরা এলিয়ে পড়লাম।

মণ্টেদা জলে নামতে নামতে গম্ভীর হয়ে বললেন, "এবার ভাত খেয়েই শুয়ে পড়বে, মনে রেখো বিকেলে ফাইনাল খেলা।" তারপর কানে আঙুল ঢুকিয়ে কয়েকটা ডুব দিয়েই তিনি উঠে পড়লেন।

গনগনে খিদে পেয়েছিল। গোগ্রাসে ভাত আর মাংস খেয়েই শুয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙিয়ে দিল, সারা টিম তখন ড্রেস করে মাঠে রওনা হবার জন্য তৈরী। সর্বাঙ্গে ব্যথা, মাথা ঝিম ধরে আছে, চোখে ঘুম জড়ানো, পেট ভার। ডাক ছেড়ে আমার কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল।

থ্রু বাড়িয়ে দিচ্ছে, ছুটতে পারছি না, হেড করার জন্য শরীর তুলতে পারছি না, সামান্য সাইড পুশেই ছিটকে পড়ছি, ভলি মারতে পা উঠছে না। মাত্র দশ গজ দূরে একবার ফাঁকা গোল পেয়েও শট নেবার আগেই সুধীর কর্মকার পা থেকে বল ছিনিয়ে নিয়ে গেল। মাঠের চারদিক থেকে টিটকারি আর গালাগাল, বিশেষ করে আমাকেই। কেননা মাঠের মধ্যে সব থেকে বয়স্ক মণ্টেদা যে রকম অনায়াসে সব থেকে কনিষ্ঠকে বোকা বানাচ্ছেন, তাতে দর্শকরা মজাই পাচ্ছিল, শুধু পাইকপাড়া অগ্রগামীর অফিসিয়ালরা ছাড়া। হাফ টাইমে আমাকে এবং লেফট হাফ ব্যাককে বসানো হল।

বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত লজ্জায় আমি আর মাথা তুলতে পারিনি। আনোয়ারকে হিংসে করেছিলাম সাঁতার না-জানার জন্য। বাঘের মতন ও খেলেছিল। ত্রিবেণী ২—০ গোলে জিতেছিল। প্রথম গোলটা পেনালটি থেকে; মণ্টেদা পেনালটি কিক করেন। আনোয়ার পরে বলেছিল, বলটা স্পটে বসিয়ে মণ্টেদা একবার গোলকীপারের দিকে তাকান। গোলকীপার দেখল মণ্টেদার চোখ ট্যারা। বেচারা ভ্যাবাচাকা খেয়ে কোনদিকে পজিশন নেবে বুঝতেই পারেনি। তার বাঁদিকে তিন হাত দূর দিয়ে বল গোলে

ঢোকে, সে ডানদিকে ডাইভ দিয়েছিল।

রাজস্থানের সঙ্গে খেলার আগের দিন রাত্রে জানলা দিয়ে গঙ্গার মতন ঘোলাটে আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার চাতরার ফাইনালের কথা মনে পড়ল। আর হাসি পেল। ওপেন নেট মিস করেছিলাম। কাল করব না, হে ভগবান কাল বৃষ্টি দিও না। আমি 'ইফ নট রেইন'-এর লিস্ট-এ আছি। জীবনের প্রথম ঘেরা মাঠে খেলার সুযোগটা নষ্ট করে দিও না। তারপর শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

॥ ৭ ॥

সকালে উঠে দেখি কখন যেন বেশ ভালোই বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশে মাঝে মাঝে নীল রঙের ছোপ। মেঘ অনেকটা কেটে গেছে। শরীরটা ঝরঝরে তাজা লাগল। মাকে বললাম, "আজ আমার খেলা আছে।"

কথাটাকে মা গুরুত্ব দিলেন না। খেলা আমার প্রায় রোজই থাকে। বললাম, "আজ প্রথম খেলব ফার্স্ট ডিভিশনে।"

মাকে আজ অন্যমনস্ক লাগল। খুবই সাধারণভাবে বললেন, "ভালো করে খেলিস।"

আশা করেছিলাম উৎসাহে মা'র চোখমুখ ঝলসে উঠবে, কিন্তু কিছুই হল না। অভিমানে আর ঐ প্রসঙ্গ না তুলে বললাম, "খাবার আছে?" মা'র মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ব্যাপারটা আমি বুঝলাম এবং রেগে উঠলাম। কিন্তু কার উপর রাগ করব ভেবে পেলাম না। অরুণা গ্লাস ফ্যাক্টরি? যেখানে লক আউট চলছে আর তাই বাবা বেকার! বাবা এখন দোকানে সামান্য একটা কাজ করেন, যা পান তাতে দু'বেলা কয়েকটা রুটি ছাড়া আর কিছু আমাদের জোটে না।

পিণ্টু বুঝতে শিখেছে আমরা দরিদ্র, ওর হাবভাবে এখনই যেন কেমন বুড়োটে ছাপ পড়ে গেছে। বায়না আবদার বা অভিমান কি রাগারাগি একদম করে না, গম্ভীর হয়ে শুকনো মুখে বেরিয়ে যায়। শুধু কান্নাকাটি জুড়ে দেয় পুতুলটা। তখন নীলিমা ওকে টেনে নিয়ে যায় নিজেদের ঘরে। কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় পুতুল খেলা করছে। নীলিমার মা দু' বছর আগে মারা গেছেন। সেই থেকে সে সংসারের কর্ত্রী। বাবা টাকা এনে ওর হাতে দেয়, নীলিমা গুছিয়ে হিসেবমত খরচ করে।

রাগটা শেষ পর্যন্ত নিজের উপরই এসে পড়ে। আমারও তো কিছু করণীয় আছে। আজ পর্যন্ত আমি শুধুই নিয়েছি, কিছুই দিইনি। ক্লাস টেন-এ ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়েছি। স্কুল ভালো লাগে না, তাছাড়া আমি বুঝে নিয়েছি লেখাপড়া করার মতন মাথাও আমার নেই। আমি ফুটবল খেলতে ভালবাসি; শুধু ফুটবলই খেলি! তাতে বাবা, মা, ভাই, বোন—কারুর কোন উপকার হয় না।

সংসারে বিন্দুমাত্র সাহায্যও আমি করতে পারি না! মাঝে মাঝে নিজেকে ফালতু মনে হয়। শুধু আড্ডা আর খেলা! কোন্ মুখে আমি সংসারে দু'মুঠো ভাত দাবী করব? ফুটবল এখনো আমাকে কিছু দাবী করার মতন জোর দেয়নি। আমার সামনে টাকা রোজগারের একমাত্র পথ খোলা রয়েছে, মাঠে। বড় ফুটবলার না হতে পারলে দেশে আমি আর একটা অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়াবো মাত্র।

তীব্র একটা জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে ড্রেস করে, ফুটবলটা হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ঢালাই লোহার নানারকম জিনিস তৈরির একটা কারখানা মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই, তার গায়ে ছোট এক খণ্ড জমি আমাদের প্র্যাকটিস গ্রাউণ্ড। এই জমিতেই ফুটবল খেলা শুরু করি। পিণ্টু রাস্তায় তার বন্ধুদের সঙ্গে তুমুল তর্ক করছিল, কানে এল ওর চীৎকার—"য্যা য্যা, জারনেলের মতন

স্টপার হতে গেলে নঈমকে আবার নতুন করে খেলা শিখে আসতে হবে।"

আমাকে দেখেই পিন্টু ছুটে এল, "দাদা, যাবো তোর সঙ্গে ?"

"আয়।"

বলটা আমার হাত থেকে ও নিয়ে নিল। ক্লাব থেকে বলটা চেয়ে নিয়ে রেখেছি। ছুটো তাপ্পি দেওয়া, আকারে অনেকটা পেয়ারার মতন। সকাল বা ছুপুরে যখনই পারি রোজ একা একা স্কিল প্র্যাকটিস করি। মাঝে মাঝে পিন্টু আর তার বন্ধুরা আমার সঙ্গী হয়।

আগে বাঁশের কঞ্চি চার হাত অন্তর পুতে বল নিয়ে এঁকেবেঁকে ড্রিবল প্র্যাকটিস করতাম। হৃষদা একদিন বললেন, গ্যারিনচাকে এভাবে প্র্যাকটিস করতে বলায়, সে নারাজ হয়ে বলে, অপোনেন্ট তো আর খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না, সে নানাভাবে বাধা দেবেই, কাজেই প্র্যাকটিস করতে হলে সচল মানুষের সঙ্গে ড্রিবল করা দরকার।

কথাটা আমার মনে ধরেছিল। সেই থেকে আমি পিন্টু আর তার বন্ধুদের পেলেই প্র্যাকটিসে ডাকি। আজ ওর বন্ধুরা কেউ এল না। কারণ জিজ্ঞাসা করতে ইতস্তত করে পিন্টু বলল, "দরকার নেই ওদের আসার।"

"কেন, কী হল ? ঝগড়া হয়েছে ?"

পিন্টু চুপ করে রইল। খানিকক্ষণ পর বলল, "তুমি নাকি একদিনও খেলায় চান্স পাওনি, বসিয়ে রেখে দিয়েছে। আনোয়ারদা আর নিমাইদা রোজ খেলে ?"

আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল, "হাঁটুতে চোট রয়েছে। প্র্যাকটিসে টিকাদার বলে একজন এমন ট্যাপ করেছে যে ভালো করে এখনো শট নিতে পারি না।"

পিন্টুর মুখ স্বস্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আর আমি মনে মনে কুঁকড়ে গেলাম। ওর কাছে আমি হিরো, আর সেটা বজায় রাখতে

মিথ্যে কথাগুলো আপনা থেকেই কেন বেরিয়ে এল, ভেবে পেলাম না। হয়তো ভয়ে। প্রচণ্ড এক স্ট্রাইকার আমার ইজ্জতের ডিফেন্স ভাঙবার জন্য আঘাত হানতে উদ্যত। আমি একটা বিশ্রী ফাউল করে তাকে আটকালাম।

কারখানার তিনতলা সমান উঁচু দেয়ালটাকে গোল বানিয়ে টারগেট শুটিং করি। ইট দিয়ে দাগ টেনে মাটি থেকে ৮ গজ × ৮ ফুট একটা ঘর করে সেটাকে ছয় ভাগ করে ১, ২, ৩ লিখে দিয়েছি। পিন্টু বা আর কেউ চেঁচিয়ে নম্বর বলে আর আমি শট করি। দেয়ালে লেগে বল ফিরছে, তখন আবার চেঁচিয়ে নম্বর বলে, আমি ফিরতি বল না থামিয়ে হেড দিয়ে কি শট করে আবার টারগেট-এ পাঠাই। এ ভাবে মিনিট দশেকেই হাঁফিয়ে যাই। একটু জিরিয়ে আবার শুরু করি। এ ভাবে প্র্যাকটিস করতে হর্ষদা আমায় বলে দিয়েছিলেন। কোনদিন শুধুই পেনালটি শট করি গুনে গুনে একশোটা, কিংবা চীপ করি, কেউ বল ছুঁড়ে দেয় হেড করি, ভলি মারি আর পিন্টুর পাঁচ-ছ জন বন্ধুর সঙ্গে ড্রিবল করি।

আজ শুধুই পিন্টু। গোলে অর্থাৎ দেয়ালে শট করছি, পিন্টু পিছন থেকে নম্বর বলছে। বল মাঝে মাঝে রাস্তার দিকে ছিটকে গেলে আমিই ছুটে কুড়িয়ে আনছি। এক সময় দেখি নীলিমা দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে। বুকের কাছে বইয়ের গোছা, পরনে নীলপাড় শাদা শাড়ি। স্কুল থেকে ফিরছে। শাড়ি পরলে ওকে কিছুটা বড় দেখায়। ওর স্কুলটা মাইলখানেক দূরে। বাসে দশ পয়সা ভাড়া, যাতায়াতের সেই কুড়িটা পয়সা বাঁচাবার জন্য হেঁটে যায় আর আসে।

বলটা রাস্তার দিকে যেতেই নীলিমার সঙ্গে চোখাচোখি হল। ও হাসল। আমি বললাম, "স্কুল থেকে?" ও ঘাড় নাড়ল। মুখটা শুকনো। কপালে কয়েকটা চুল ঘামে সেঁটে রয়েছে।

আঁচল দিয়ে গলা ও ঘাড়ের ঘাম মুছল।

"আমার স্কুল বসবে বিকেলে!" বলে আমি হেসে উঠলাম।

"তাই বুঝি পড়া তৈরি করছ?" নীলিমার সাজানো দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠল।

"আমি খুব খারাপ ছাত্র, প্রমোশন পাব কিনা জানি না!" হতাশার ভাণ করে বললাম।

"খাটলে পাশ করবেই করবে।"

নীলিমার স্বরে, চোখে, এমনকি দাঁড়াবার ভঙ্গিতে আর পরিহাস নেই। আমার ভিতরে আলতোভাবে একটা প্রত্যয় পাখির মতন ডানা মেলে ভেসে এল। হাতের বলটাকে হঠাৎ কিক করে সোজা শূন্যে তুলে দিলাম। পিন্টু চীৎকার করে উঠল "তিন"।

একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে ফেললাম। চিত হয়ে মাটিতে শুয়ে বলটাকে ব্যাক ভলি করলাম। এভাবে জীবনে কখনো মারিনি। আশ্চর্য, আশ্চর্য, তিন নম্বর টারগেট-এর মাঝখানে বলটা দুম করে লেগে ফিরে এল। পিন্টু দু' হাত তুলে চীৎকার করে বলটার পিছু ধাওয়া করল। নীলিমার বড় বড় চোখ দুটো আরো বড় হয়ে গেছে, আর আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, আমিই প্রসূন ভটচাজ কিনা!

"দাদা আর একবার।" পিন্টু আমার কাছে বলটা পাঠিয়ে দিয়ে বলল।

ভালোভাবেই জানি, ব্যাপারটা আন্দাজে এবং ভাগ্যের জোরে হয়ে গেছে। আর একবার করতে গেলে, কারখানার চালার উপর দিয়ে বল উড়ে যাবে কি রাস্তার ওপরে পড়বে, তা ভগবানও জানে না।

"হাঁটুতে একটা চোট আছে, এখনো ভালো করে সারেনি।" নীলিমাকে বললাম, "ফট করে যদি লেগে যায়..."

"না-না, আর করতে হবে না!" নীলিমা ব্যস্ত হয়ে বলল।

"আর একবার মারি।"

“না-না, আগে পুরোপুরি সারুক।” নীলিমা হাত তুলে বারণ করল। আমি হাঁফ ছাড়লাম। স্ট্রাইকারকে আটকাতে ছোটখাট ফাউল করাটা খেলার মধ্যেই পড়ে।

“বড্ড খিদে পেয়েছে।” পেটে হাত দিয়ে চোখ-মুখ করুণ করে তুললাম। আমি জানি নীলিমার সঙ্গে ছোট্ট একটা প্ল্যাসটিকের পয়সা রাখার ব্যাগ সব সময় থাকে।

“অমনি খিদে পেয়ে গেল, পড়া শুরু করতে না করতেই!” দু' আঙুলে ব্লাউজের মধ্য থেকে ব্যাগটা বার করতে করতে নীলিমা ধমকে উঠল। খুট করে ব্যাগের বোতামটা খুলে ও বলল, “বেশি নেই, তিরিশটা পয়সা বড়জোর দিতে পারি।”

“মোটে তিরিশ! এমন একটা ব্যাক ভলি দেখালাম!”

“আচ্ছা, পঁয়ত্রিশ।”

“না-না, প্লীজ, আট আনা করো। বদুর দোকানে চারটে কচুরি আর দুটো জিলিপি। ভীষণ খিদে!”

এবার আর ভাণ নয়। আন্তরিকতার সঙ্গেই বললাম। নীলিমা আমার মুখ দেখেই বুঝল এবং একটি আধুলি দিল।

“ধার রইল।”

“এই নিয়ে কত হল?” গম্ভীর হয়ে নীলিমা বলল।

“হিসেব রেখো, সব একবারে শোধ করে দেবো।”

নীলিমা বাড়ি চলে গেল। গত এক বছরে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট টাকা এইভাবে ওর কাছ থেকে নিয়েছি। প্রতিবারই বলেছি, লিখে রেখো সব শোধ দিয়ে দেবো। নিশ্চয়ই দেবো। আমার এই পরিশ্রম বৃথা যাবে না, যেতে দেবো না।

পয়সা হাতে আসতেই খিদেটা চনচনে হয়ে চাড়া দিল। বলটা পিণ্টুকে দিয়ে বললাম, “বাড়ি চলে যা।”

“আর খেলা উচিত নয়। চোটটা আবার চাগিয়ে উঠতে পারে।” বিজ্ঞের মতন পিণ্টু আমাকে উপদেশ দিল। হাসি পেলেও, হাসলাম না আমি। পিণ্টু বল নিয়ে ধাপাতে ধাপাতে

চলে গেল।

মিনিট পনেরো পরে বহুর দোকানে গরম কচুরি আর জিলিপি খেয়ে জলের গ্লাসটা হাতে নিয়েই মনে পড়ল, পিণ্টুরও খাওয়া হয়নি আজ। পাথর হয়ে গেল আমার সর্বাঙ্গ। শুধু পেটের মধ্যেটা মুচড়ে উঠল।

॥ ৮ ॥

আমি আর পলাশ টিকাদার পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে আবার আকাশের দিকে তাকালাম। আকাশের উত্তর আর পূব নীলে-ধূসরে মাখা। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিমে গাঢ় কালো মেঘ। বাতাস বইছে না। ভ্যাপসা গরমে আমরা ঘামছি। বৃষ্টি হবে কি হবে না, বোঝা যাচ্ছে না। আমার প্রথম খেলার ভাগ্য লেখা রয়েছে আকাশে।

ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া বয়ে গেল। মেঘটা ছড়িয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে আসছে—তার একটা কোণ মহমেডান মাঠের দিকে। টিকাদারের মুখ খুশিতে ভরে উঠল। বুট পরার জন্য সে টেণ্টের ভিতরে চলে গেল। আমি আকাশে তাকিয়ে রইলাম। মেঘটা ছড়াচ্ছে পশ্চিম দিকে, হাওয়া বইছে পশ্চিমে। হাঁফ ছাড়লাম।

বুট পরে টেণ্ট থেকে বেরিয়ে টিকাদার আকাশে তাকিয়েই বিরক্ত হল। আমার মুখে ক্ষীণ হাসি দেখে সে আবার টেণ্টে ঢুকে গেল। এর দশ মিনিট পরেই এক পশলা বৃষ্টি দিয়ে ভেসে পালাল একটা ছোট্ট মেঘ। আমি বুট হাতে শুকনো মুখে টেণ্টের এক কোণে দাঁড়িয়ে। নিমাই বুট পরতে পরতে আমাকে লক্ষ্য করছিল। কাছে এসে বলল, “খেলবি আজ?” জবাব না দিয়ে আমি মুখ ঘুরিয়ে টেণ্টের বাইরে চলে গেলাম।

মিনিট পাঁচেক পরই বিপিনদা ব্যস্ত হয়ে আমাকে খোঁজাখুজি

শুরু করলেন।

"কাণ্ড ছাখো তো, খেলার ঠিক আগেই বমি শুরু হল। প্রসূন কোথায়, প্রসূন···এই যে ছাখো তো নিমাইয়ের কাণ্ড! যাও, যাও ড্রেস করো।"

বেঞ্চে নিমাই শুয়ে। হাত দিয়ে চোখ ঢাকা। হঠাৎ নাকি বমি করতে শুরু করেছে। ড্রেস করে বেরোবার সময় আনোয়ারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী হল রে?"

নির্বিকারভাবে আনোয়ার বলল, "আধ শিশি আইডিন খেলে বমি তো হবেই।"

শোনামাত্র বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠল। শুধু বললাম, "বাঙালটা সব পারে।" নিমাইয়ের কাছে গিয়ে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললাম, "গুনে গুনে তিনটে গোল দেবো।"

চোখ থেকে হাত না সরিয়ে নিমাই বলল, "মোহনবাগানকে তো?"

"না—" শেষ করার আগেই থেমে গেলাম। হাত নামিয়ে নিমাই জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে।

বললাম, "আজকে।"

আমি হ্যাটট্রিক করতে পারলাম না প্রথম খেলায়। শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমাদের ডিফেনডিং জোনে নেমে এসে আমাকে ট্যাকল করতে হল রাজস্থানের হাফ-ব্যাকদের। আনোয়ারের ছ' পাশ দিয়ে ছুটো ছেলে, সুকল্যাণ আর সুভাষ বেরোচ্ছে। আমরা দশজন পেনালটি বক্স-এর মধ্যে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে পাঁচ গোল খেয়ে যাওয়ার কথা। সুকল্যাণের ডান পা থেকে বেরোন তিনটে গোলার একটা পোস্ট-এ, একটা আনোয়ারের কাঁধে আর অন্যটা গোলকীপার, কোন্ যাতুমন্ত্রে জানি না, বারের উপর দিয়ে তুলে দিল। বাকি ছুটো নষ্ট করল সুভাষ নিজেই। তারপর ১৮ মিনিটে কীভাবে যেন একটা বল ছিটকে সেন্টার লাইনের কাছে চলে এল। আমি বলটা ধরে

রাজস্থান গোলের দিকে তাকিয়ে দেখি—গোলকীপার আর আমার মাঝে শুধু ওদের স্টপার-ব্যাক ফেন।

মাঝ মাঠ থেকে আমি বল নিয়ে দৌড়তে শুরু করলাম, একটু কোণাকুণি, ডান দিকের কর্ণার ফ্ল্যাগের দিকে। ফেন আমার সঙ্গেই দৌড়চ্ছে, তার বাঁ দিক কভার করে। লেফ্‌ট্ ব্যাক নেমে আসছে। বয়স্ক ফেনকে মুখোমুখি কাটাতে পারব বলে ভরসা হল না। স্পীডে হারাবো স্থির করেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বলটা বাঁ দিকে প্রায় ১৫ গজ ঠেলে দিয়ে ফেনকে ডানদিক থেকে প্রচণ্ড দৌড়ে পিছনে ফেলে দিলাম। পেনালটি বক্স-এর মধ্যে যখন ঢুকছি, গোলকীপার অরুণ তীরবেগে এগিয়ে আসছে! সেই সঙ্গে দু-পাশ থেকে দুই ব্যাক।

আমি শুধু অরুণের শরীরের ভঙ্গিটা লক্ষ্য করলাম। লাফ দেবার আগে বেড়াল যেমন করে, সেই রকম শরীরটাকে ধনুকের ছিলার মতন টেনেছে। আমি বাঁদিকে হেলে যাওয়া মাত্রই ও দু' হাত বাড়িয়ে ভেসে এল। আমি মুহূর্তে ডানদিকে বলটাকে টেনে নিলাম এবং ডান পায়ের নিখুঁত নিচু পাঞ্চ-এ ডান পোস্ট ঘেঁষে বলটাকে গোলের মধ্যে পাঠালাম আর সেই সঙ্গেই লেফট ব্যাকের প্রচণ্ড চার্জ-এ মাটিতে ছিটকে পড়লাম।

আমার প্রথম গোল! মাটিতে কাত হয়ে এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটার দিকে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি আর জালের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বাদামী রঙের ওই গোলাকৃতি বস্তুটা কী নিরীহভাবে বিশ্রাম করছে। আমার সারা পৃথিবী এখন মনে হচ্ছে ওই বলটা। ইচ্ছে করছিল বলটাকে দু-হাতে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরি।

আমাকে তুলে ধরল দুজনে। রাইট উইং আর রাইট ইনসাইড আনোয়ার দু-হাত তুলে ছুটে আসছে। আমার মাথা ঘুরছে তখন। আনোয়ার কী সব বলতে বলতে গালে চুমু খেলো। মেম্বার গ্যালারির দিকে তাকালাম। গোটা পঞ্চাশেক লোকও

হবে না। মাত্র এই ক'জন সাক্ষী রইল আমার প্রথম গোলের। শোভাবাজারের গোটা টিমটাই আমাকে জড়িয়ে ধরছে, পিঠ চাপড়াচ্ছে। গ্যালারি থেকে কে একজন চীৎকার করে ঠাট্টা করল, "হয়েচে রে হয়েচে, এবার সেণ্টার কর, যেন শীল্ড পাবার গোল দিয়েছিস!" শুনে আমি খুব লজ্জা পেলাম।

দু' মিনিটের মধ্যেই রাইট উইং-এর ক্রস সেণ্টার থেকে সুভাষ হেড করে গোল করল। পরের মিনিটেই আবার একটা একইভাবে হেড করে। হাফ টাইম-এর সময় বিপিনদা এসে উত্তেজিতভাবে আমায় নির্দেশ দিলেন, "নামবে না তুমি, একদম-নামবে না সেণ্টার লাইনের এধারে। গোল খাই খাবো, তুমি উঠে থাকবে। আর রতন, তুই শুধু বল বাড়াবি।"

রতন হচ্ছে সেই ছেলেটি, প্রথম দিনে যার নাক ফাটতে দেখেছি প্র্যাকটিসের সময় আর যাকে বিপিনদা একটা চাকরি দেবেন বলেছেন। রতন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তার ক্লান্ত শরীরটা মাটিতে শুইয়ে চোখ বুঁজল।

একটা অ্যালুমিনিয়াম গেলাশ আর এক বালতি জল। এক-জন জল খেয়ে গেলাশটা আর একজনের হাতে দিচ্ছে, সে বালতিতে ডুবিয়ে জল তুলে খাচ্ছে। গেলাশের জন্য অপেক্ষা করছি, তখন টিকাদার বলল, "খাওয়াচ্ছিস তো আজ!"

"কেন?" বিরক্ত হয়ে বললাম।

"সীজন-এ শোভাবাজারের প্রথম গোল স্কোর করলি!"

আমি ফিকে হেসে জলের গেলাশের জন্য হাত বাড়ালাম। টিকাদার বলল, "টিমে আমার জায়গাটা তো খেলি, কমপেনসেট করবি না?"

শুনে আমার ভালোই লাগল। বললাম, "আজ নয়, আর একদিন।"

মাঠে নামবার আগে একবার গ্যালারির দিকে তাকালাম। একেবারে মাথায় এক কোণে কুঁজো হয়ে নিমাই বসে। ওকে

আমরা টেন্টের মধ্যে শুইয়ে রেখে বেরিয়েছিলাম। আমায় তাকাতে দেখে চট করে ও হাত তুলল। দেখলাম হাতের আগায় তিনটে আঙুল উঠে রয়েছে।

সুভাষের হ্যাটট্রিকের জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে ওরা আরো দুটো গোল নষ্ট করার পর সুকল্যাণ হঠাৎ একটা গোল করে মুষড়ে পড়ল। ও বুঝতেই পারেনি ৩৫ গজ দূর থেকে মারা বলটা বিনা বাধায় গোলে ঢুকে যাবে। সুভাষ বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের ঘুষি মেরে রাগে ঘোঁতঘোঁত করতে করতে ফিরে গেল এবং দু' মিনিটের মধ্যেই আনোয়ারকে ছিটকে ফেলে দিল শোল্ডার চার্জ-এ।

আমার কিন্তু অবাক লাগল রতনকে। বিপিনদার নির্দেশই শুধু নয়, ও যেন নিজের দলের বাকিদের কথাও ভুলে গেছে। বল পেয়ে ও একাই ছুটছে। আমি চেঁচাচ্ছি বলের জন্য কিন্তু রতন কানেই নেয় না। জিরজিরে বুকটা হাপরের মতন ওঠানামা করছে, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে, মুখ লাল, ঘাম গড়াচ্ছে রগ বেয়ে থুতনি পর্যন্ত। তবু রতন তাড়া করছে, বল ধরে আবার একাই এগোচ্ছে এবং যথারীতি ওর পা থেকে বল ওরা কেড়ে নিচ্ছে। কিছু যেন ভর করেছে ওকে, সারা মাঠ চষছে, কিন্তু বোকার মতন, অযথা। আমি অধৈর্য, বিরক্ত হয়ে পড়ছিলাম। মাঠের বাইরে থেকে বিপিনদার চীৎকার কানে এল, "বল ছাড়, রতন! বল ছাড়, প্রসূনকে দে।"

রতন বল ছাড়ার বদলে নিজেই মাঠ ছাড়ল। পায়ে পা জড়িয়ে পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারছিল না। দু-তিনজনে ওকে ধরে মাঠের বাইরে রেখে এল আর ওর জায়গায় নামল টিকাদার। তারপরই রাজস্থান পেনালটি পেল। ওদের লেফট আউট আমাদের দুজনকে কাটিয়ে গোল পোস্ট-এর কাছে এসে ব্যাক সেন্টার করতে যাবে, টিকাদার তার পেটে লাথি মারল। পেনালটি থেকে গোলটা করল সুভাষ।

৪—১ গোলে এগিয়ে থেকে ওরা এবার একটু আলগা দিল। আমি দু'বার বল পেয়েও কিছু করতে পারলাম না। রাইট উইং-এর একটা ক্রস পাস ভলি মেরে বারের উপর দিয়ে পাঠালাম। আর একবার দুজনকে কাটিয়ে সামনেই পড়ল ফেন। পাশে কেউ নেই যে ওয়াল করব। তাড়াতাড়ি পেনালটি বক্স-এর মাথা থেকেই গোলে মারলাম, অরুণ আঙুলের ডগা দিয়ে বলটা তুলে বারের ওপারে পাঠিয়ে দিল।

আমার তখন নিমাইয়ের কথা মনে হল। নিমাই থাকলে, ওকে বলটা ঠেলেই ডানদিকের পোস্ট-এর ৪৫ ডিগ্রির কোণ বরাবর আমার জায়গায় চলে যেতাম। নিমাই ঠিক বলটা পাঠিয়ে দিত আমার এক গজ সামনে। তারপর শরীরটাকে বাঁ দিকে একটু হেলিয়ে ডান পা-টাকে পিছনে এক ফুট তুলে বিদ্যুৎ গতিতে একটি ছোবল।

খেলার শেষ বাঁশি বাজার পর মাঠেই আনোয়ার আর টিকাদারের মধ্যে একটা খণ্ডযুদ্ধ প্রায় বেধে যাচ্ছিল। কারণ সেই পেনালটি। আনোয়ারের মতে, টিকাদার অযথা গোল খাইয়েছে লাথিটা মেরে। লেফট আউট ব্যাক-সেণ্টার করতই, কিন্তু তা থেকে গোল নাও হতে পারত, চান্স পাওয়া যেত ক্লিয়ার করার। কিন্তু পেনালটি করিয়ে টিকাদার রাজস্থানকেই শিওর চান্স করিয়ে দিয়েছে।

জবাবে টিকাদার কতকগুলো অশ্রাব্য শব্দ উচ্চারণ করল, তখন আনোয়ার তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। টিকাদার ভয়ঙ্কর চোখে আনোয়ারের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে, দাঁত চেপে 'আচ্ছা, দেখা যাবে—' বলে মাঠ থেকে বেরিয়ে এল।

নিমাই গ্যালারি থেকে নেমে এসেছে। বিপিনদা আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "বেশ, বেশ, ভালোই খেলেছ।" রতন আমার দিকে অদ্ভুত চোখে একবার তাকাল। কেমন যেন বিষণ্ণতা আর ভয় ওর চাহনিতে। দুটো টোস্ট আর একটা সিদ্ধ ডিম খেয়ে

একদিন আমিও গেছলুম। বসিয়ে রেখে দিল। বড় ক্লাবের মোহ ছাড়তে পারলুম না। আশায় আশায় পরের বছরও রইলুম। একটা মাত্র ম্যাচ খেলালে। তাও আধখানা। তারপর উয়াড়ি, তারপর এখানে। আমারও ইচ্ছে ছিল তোমার মতন—আরো বড় হবো।"

রতনের স্বর মৃদু হতে হতে গড়ের মাঠের আবছা সন্ধ্যার সঙ্গে মিশে গেল। আমার মনটা ভারী হয়ে উঠল, মাথা নামিয়ে চুপ রইলাম। রতন গাঢ় স্বরে বলল, "আজ আমি খেলেছি ভয় পেয়ে। তুমি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। টিমে আমার পজিশন বোধহয় গেল, এই চিন্তাই শুধু মাথায় ঘুরছিল। কিছু মনে কোরো না!" ও আমার হাতে চাপ দিল। আমি মাথা নাড়লাম।

রতন গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, "তুমি গোল দাও, অনেক গোল দাও, বড় ক্লাবে যাও। আর শরীরের যত্ন কোরো। আরো ওজন বাড়াতে হবে, আরো খাটতে হবে তোমার; এজন্য স্বার্থপর হতে হবে, বাড়ির জন্য ভেবে উপোস দিও না, বরং অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে খাবে। গরীবদের নিষ্ঠুর হতে হবে যদি বড় হতে চায়, নয়তো আমার মতন হবে; এই রকম স্বাস্থ্য নিয়ে কি বড় ফুটবলার হওয়া যায়? প্রসূন, দয়ামায়া মমতা বড় ভয়ঙ্কর শত্রু।"

রতন আচমকাই আমাকে ফেলে রেখে টেন্টের মধ্যে চলে গেল। আনোয়ার আর নিমাই অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল। আমার কাছে আসতেই ওরা জানতে চাইল, কী কথা হচ্ছিল। এমন মন ভারী বিষণ্ণ হয়ে গেছল। বললাম, "পরে বলব। এমন কিছু সিরিয়াস কথা নয়।" তারপর কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, "হ্যাটট্রিক হল না রে, নিমাই।"

"খেলা দেখতে দেখতে ইচ্ছে করছিল রাজস্থানের দিকে নেমে পড়ি। শিওর তাহলে সুভাষের হ্যাটট্রিক করিয়ে দিতুম।" নিমাই

যখন আমরা তিনজন বাড়ির পথে রওনা হচ্ছি, রতন ইশারায় আমাকে ডাকল।

"তুমি গরীব ঘরের ছেলে, আমিও তাই," রতন ভারী এবং স্থির স্বরে বলল, "এখানে টাকা দেয় না সুতরাং তুমি নিশ্চয় পরের বছর অন্য ক্লাবে যাবে। যাবেই, আমি জানি, তোমার খেলা আছে, তুমি এখানে পচে মরবে কেন!"

আমি চুপ করে রইলাম। রতন আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, "আমাকে একটা চাকরি দেবে বলেছে বিপিনদা।"

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে বললাম, "জানি।"

"তুমি যদি চাকরি চাও, তাহলে বিপিনদা আগে তোমার জন্যই চেষ্টা করবে। আমি জানি, আজ তোমার খেলা দেখে বুঝতে পেরেছি।" রতনের স্বর হঠাৎ করুণ দুর্বল হয়ে এল। কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে আমার হাতটা ও চেপে ধরল, "চাকরিটা আমার দরকার! আমার বাড়িতে ভীষণ খারাপ অবস্থা, আমার আগে চাকরিটা দরকার প্রসূন। কথা দাও, তুমি এখানে কিছু চাইবে না। কথা দাও, তুমি এখানে সামনের বছর থাকবে না।"

আমি ওর চোখের দিকে তাকাতে পারলাম না। অন্যদিকে তাকিয়ে বললাম, "আমি এখানে থাকতে আসিনি। আরো বড়ো হতে চাই। বড়ো ক্লাবে যেতে চাই।"

রতন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হাতে চাপ দিয়ে বলল, "কোথায় যেতে চাও, আমার অনেক চেনা আছে। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, এরিয়ান, যুগের যাত্রী?"

"মোহনবাগানে।"

"এখনি? না, আর একটা বছর অন্তত কোথাও কাটাও। তুমি এখনো নেহাতই জুনিয়ার। এখনি অতবড় ক্লাবে যেও না, বসিয়ে রাখবে। এখন একটা বছর নষ্ট হওয়া মানে ভীষণ ক্ষতি। দেখছো না, আমার অবস্থা। লোভে পড়ে বড় ক্লাবে

খুব গম্ভীর হয়ে বলল, "কী রকম ডিফেন্স্ ভেঙে ঢোকে দেখেছিস ?"

কথাটা আনোয়ারের গায়ে লাগল। তাচ্ছিল্য ভরে বলল, "দেখেছি, সব তো এক-ঠেঙে। শুধু স্পীড আর শট ছাড়া আছেটা কী? হাবিবকে ওয়াচ করিস। কী রকম ওঠানামা করে, অন্যকে খেলায়, স্পেস কভার করে, কী দারুণ রোখ নিয়ে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

নিমাই আর কথা বলল না। বাসে ওঠার আগে আমি ওদের বললাম, "কিন্তু সামনের বছর অন্য ক্লাব দেখতে হবে। এখানে আর নয়।"

॥ ৯ ॥

বিপিনদা কীভাবে যেন জানতে পারলেন, সামনের বছর আমরা তিনজনই শোভাবাজার ইউনিয়ন ছাড়ব ঠিক করেছি। তিনি আমাদের তিনজনকেই একদিন আড়ালে ডেকে বললেন, "তোদের জুনিয়ার বেঙ্গলে খেলাবো, সামনের বছরটা থেকে যা।"

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। কেউ কথা বললাম না। ভিতরে একটা অস্বস্তি শুরু হল, কেননা আমরা জানি বিপিনদা তা পারেন। আই-এফ-এতে শোভাবাজারের সেক্রেটারি পরিমল ভটচাজের একটা দল আছে, যারা সব ক'টা কমিটি দখল করে আছে। তারাই শলাপরামর্শ করে লীগে ওঠা-নামা বন্ধ করিয়েছে গভর্ণিং বডির মিটিং-এ। এতে তাদের বড় লাভ—ফুটবল লীগে প্লেয়ারদের জন্য যে খরচ করতে হতো, সেটা আর করতে হল না। কেউ টাকা চাইলেই তারা এখন বলে দিতে পারে—গেট খোলা আছে, বেরিয়ে যাও। আমরা রাস্তা থেকে এগারোটা ছেলে ধরে এনে খেলাবো। সব ম্যাচ হারলেও, একটা পয়েন্ট

না পেলেও কিছুই আসে-যায় না, ওঠা-নামা তো বন্ধ!

সত্যি বলতে, অবস্থাটা এই রকম না হলে আমাদের মতন আনকোরা উটকো তিনজন ফার্স্ট ডিভিশনে খেলার সুযোগ এত তাড়াতাড়ি পেতাম কিনা সন্দেহ। প্রতি বছরই শোভা-বাজারের অন্তত দু-তিনজন জুনিয়ার বেঙ্গল টিমে থাকে জুনিয়ার ন্যাশনাল চ্যামপিয়নশিপে। জুনিয়ার ইনডিয়া টিমেও দুজন ছিল গত বছর।

"বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি আমার কথা?" বিপিনদা খুব গম্ভীর হয়ে বললেন।

"না-না, তা কেন, তবে—" নিমাই আমাদের মুখপাত্র হয়ে বলল।

"তবে কী? টাকা চাই, চাকরি চাই?"

"না, তা নয়, বড় ক্লাবে খেলার ইচ্ছে তো সকলেরই থাকে।" নিমাই বলল।

"জুনিয়ার বেঙ্গল, জুনিয়ার ইনডিয়া, এর থেকেও বড় ক্লাব আর কী আছে! আগে এসব ছাপ নিয়ে নে, তখন দেখবি বড় ক্লাব তোদের বাড়িতে গিয়ে সাধাসাধি করবে।"

বলতে ইচ্ছে করল, অমন গণ্ডা গণ্ডা ইনডিয়া ছাপ-মারা প্লেয়ার ময়দানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্লেয়ার তো মাত্র দু-তিনজন হতে পেরেছে। কিন্তু এসব কথা এখন বলে কোন লাভ নেই, তাতে তিক্ততাই শুধু বাড়বে। তাই বললাম, "বিপিনদা, আমরা ভালো করে খেলা শিখতে চাই, ভালো প্লেয়ারদের পাশে থেকে খেলতে চাই। দেখছেন না, প্রত্যেকটা ম্যাচে নিমাই-আনোয়ারের অবস্থা, আমার অবস্থা। কেউ সামলাতে পারে না, আটকাতে পারে না, একটা পাস দিতে পারে না ঠিকমত, দম নেই, স্কিল নেই, বুদ্ধি নেই। এখানে আমি উৎসাহ পাই না। একা একা কি ফুটবল খেলা যায়?"

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। গলা চড়ে গেল।

নিমাই আর আনোয়ার আমার কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে সায় দিচ্ছিল।

বিপিনদার মুখ থমথমে হয়ে উঠল। "তোরা ক্লাব ছাড়লে পরিমলদা চটবে। ওকে চটিয়ে পারবি উঁচুতে উঠতে? প্রত্যেকটা ক্লাব ওকে ভয় করে। ইনডিয়া টিমে তোদের খেলা বন্ধ করে দিতে পারে, যতই ভাল তোরা খেলিস না কেন। আর, তারই ক্লাবে তোরা খেলবি না, রিকোয়েস্ট সত্ত্বেও?"

আমরা আবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

আমরা যে দ্বিধায় পড়েছি বিপিনদা বোধহয় সেটা বুঝতে পারলেন। "একটা বছর থেকে যা। সামনের বছর সম্ভবত আবার প্রমোশন-রেলিগেশন চালু হবে। আমাদের ক্লাবের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছিস, কয়েকটা মাত্র মেম্বার, আই-এফ-এর ডোনেশনে কি সারা বছর এতগুলো খেলা চলে? এর-ওর কাছে ভিক্ষে করেই চালাতে হয়। তবু কথা দিচ্ছি সামনের বছর কিছু কিছু হাত-খরচা দেবার চেষ্টা করব। থেকে যা তোরা। শোভা-বাজারই তোদের প্রথম ফার্স্ট ডিভিশনে খেলিয়েছে, এটা ভুলে যাসনি। তোরা বড় হবি, ফেমাস হবি—এটা কি আমরাও চাই না? তখন কি আমরাও গর্ব করব না?"

বিপিনদাকে অত্যন্ত করুণ দেখাচ্ছে। গলার স্বর গাঢ় আর ভিজে। ভিতরে ভিতরে আমরা বিচলিত হয়ে পড়ছি। পরিমল ভটচাজকে আমরা চোখে দেখেছি মাত্র, আর ওর সম্পর্কে শুনেছি অনেক কথা। নিজের স্বার্থ আর ক্ষমতা রক্ষার জন্য উনি যাবতীয় অপকর্ম করতে পারেন ও করেন। যে কোন ফুটবলারের কেরিয়ার খতম করা ওর পক্ষে অতি সামান্য ব্যাপার। বিপিনদা সে সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন একটা হুমকিও দিলেন।

নিমাই হঠাৎ বলল, "আচ্ছা, আমরা দু-দিন ভেবে আপনাকে জানাব।"

বিপিনদা আমাদের তিনজনের মুখের দিকে পর পর তাকিয়ে

ঘাড় নাড়লেন।

আমি হর্ষদার কাছে গেলাম। ছাদে গোটা কুড়ি টবের মাঝে উবু হয়ে হর্ষদা ফুলগাছের পরিচর্যা করছিলেন। আমার কথা শুনতে শুনতে উনি টবের মাটি খুঁড়ে যাচ্ছিলেন একটা শিক দিয়ে। অনেকক্ষণ কথা বললেন না। একটা গোলাপের শুকনো মরা ডাল গাছ থেকে সাবধানে ভেঙে নিয়ে হর্ষদা মৃদু স্বরে বললেন, "তোর ইচ্ছেটা কী?"

"আমি এখনো ঠিক করতে পারিনি ক্লাব বদল করব কি করব না। নিমাই-আনোয়ারেরও আমার মতন দোটানা অবস্থা। ওরা একবার বলছে, থেকেই যাই, একটা বছর তো! আবার বলছে, ধ্যুত, একটা বছর স্রেফ অযথা নষ্ট করা।"

"প্রসূন, এখন তোর সামনে চ্যালেঞ্জ, নিবি কি নিবি না, সেটা তুই-ই ঠিক কর।"

আমি শক্ত হয়ে গেলাম, হর্ষদার গলার স্বর অত্যন্ত ঠাণ্ডা অথচ দৃঢ়। আমি চুপ করে রইলাম মরা গোলাপ ডালটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। হর্ষদা তা লক্ষ্য করে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। "ডালটা মরে গেছে, কিন্তু গাছটা গ্যাখ কেমন জীবন্ত। অন্য ডালে কতগুলো কুঁড়িও ধরেছে। এরকম হয়, সর্বক্ষেত্রেই হয়। মানুষ বেড়ে ওঠে আর ফেলে যায় তার মরা ডালপালা। নতুন ডালে ফুল ফোটায়। এজন্য পরিচর্যা চাই। সার, জল, রোদের তাপ তাকে দিতে হয়। শিকড় থেকে পাতার মধ্যে দিয়ে সে প্রাণশক্তি আহরণ করে। যদি শিকড় নষ্ট হয়, পরিচর্যা না পায়, তাহলে বাড়তে পারে না। মানুষের শিকড় তার চরিত্র। তুই যদি অনুগ্রহ নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে বড় হতে চাস তো তোর শিকর পচে যাবে। এই গাছটা বেড়েছে ফাইট করে। আমি একে হেল্প করেছি মাত্র। মানুষ হেল্প নাও পেতে পারে, তখন নিজেকে নিজে হেল্প করতে হয়।

যার চরিত্র পচে গেছে, সে পারে না। হেরে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। চ্যালেঞ্জ নানা রকম চেহারা নিয়ে আসে, আর মানুষকে তার মোকাবিলা করতে হয়।”

শুনতে শুনতে টের পেলাম সারা শরীরে কলকল শব্দে রক্ত ছুটছে, আর দূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট একটা স্বরের মতন আমার বুকের মধ্যে ঢেউ উঠছে। সেই ঢেউয়ের চুড়োয় দাঁড়িয়ে কে যেন বলছে, “স্ট্রাইকার! স্ট্রাইকার! তোমার সামনে দুর্ভেদ্য ডিফেন্স। ভাঙতে কি পারবে না?”

আমি মাথা নামিয়ে নিজেকে শুনিয়ে বললাম, “পারবো।”

হর্ষদা অবাক হয়ে একবার তাকালেন, তারপর মরা ডালটা ছুঁড়ে ফেলে বললেন, “মনে আছে, তোকে হেমিংওয়ের একটা গল্প একবার বলেছিলাম—ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী! তাতে এক জায়গায় আছে, ম্যান ক্যান বী ডিফিটেড বাট···তুই লেখাপড়া শিখলি না কেন রে প্রসূন? তাহলে ইংরিজিতেই বইটা নিজে পড়তে পারতিস। মুখে বললে অনেক কিছু যে নষ্ট হয়ে যায়।”

“আমার মনে আছে হর্ষদা, মানুষকে হারানো যেতে পারে, কিন্তু ধ্বংস করা যেতে পারে না, তাই না?” এই বলে আমি আর সেখানে থাকিনি।

॥ ১০ ॥

রাস্তায় বেরিয়ে এলোমেলো হাঁটতে শুরু করি। একা প্রায় ঘণ্টাখানেক আমি হাঁটি। অনেক চেনা ছেলের সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু আমি তাদের দেখতে পেলাম না। তারা চোখের উপর দিয়ে ভেসে গেল। অনেক ডাকল, আমি শুনতে পেলাম না। ভূতে পাওয়ার মতন আমি শুধু হাঁটলাম। আর হর্ষদার কথাটা আওড়ালাম মনে মনে, এখন তোর সামনে চ্যালেঞ্জ, নিবি কি নিবি না, সেটা তুই ঠিক কর।'

"অ্যাই প্রসূন, দেখতেই পাচ্ছ না যে।" থমকে দাঁড়ালাম। নীলিমা সামনে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে। কোমরে হাত, চোখে বিস্ময়।

"বাব্বাঃ, খবরের কাগজে নাম বেরোয় তাতেই এই, ছবি বেরোলে কী হবে?"

লজ্জা পেয়ে আমতা আমতা করে বললাম, "যাঃ, ও রকম নাম গণ্ডা গণ্ডা লোকের রোজই বেরোয়। শোভাবাজার ইউনিয়নের প্লেয়ারের আবার নাম! সত্যি বলছি, দেখতে পাইনি তোমায়। কোথায় গেছলে? বাড়ি যাচ্ছ এখন?"

লজ্জাটা কাটিয়ে ওঠার জন্য এলোপাতাড়ি প্রশ্ন করলাম, প্রেশারে পড়ে গ্যালারিতে বল ওড়ানোর মতন।

নীলিমা এবার সত্যিই অবাক হয়ে বলল, "সে কী, এই সময় টিউশনি থেকে রোজ ফিরি তা ভুলে গেছ? কী ব্যাপার, বলো তো? হাত তুলে দাঁড়াতে বললাম, দাঁড়ালে না। একমনে চলেছ তো চলেছই। কথা বলছ, যেন এই মাত্র পরিচয় হল। উঁ, হয়েছে কী?"

"একটা ব্যাপারে মুশকিলে পড়ে গেছি, সেটা নিয়েই চিন্তা করছিলুম। হর্ষদার বাড়ি থেকে ফিরছি। চলো একটু হাঁটা যাক্।"

আমরা দুজনে মন্থরগতিতে হাঁটতে শুরু করলাম। কেউ কথা বলছি না। নীলিমা গম্ভীর হলে গিন্নিবান্নি দেখায়। মা-মরা সংসার দু-বছর ধরে চালাতে চালাতে ও রীতিমত ভারিক্কী হয়ে গেছে। নানান দিক ভেবেচিন্তে বাবার সামান্য আয় আর নিজের টিউশনির টাকায় ওকে সংসার চালাতে হয়। তার উপর নিজের স্কুলের পড়া আছে।

হর্ষদার কথাগুলো মনে পড়ছে আর যেন গায়ে ছেঁকা লাগছে—'যার চরিত্র পচে গেছে, সে পারে না!' 'মানুষের শিকড় তার চরিত্র!' 'চ্যালেঞ্জ নানা রকম চেহারা নিয়ে আসে!' ব্যাপার কী! এই সব ভালো ভালো কথা দিয়ে আমি কী করব? ফুটবল, ক্লাব-বদল, বেঙ্গল কি ইনডিয়া টিমে খেলার সঙ্গে এগুলির কী সম্পর্ক? আমার স্কিল, স্পীড, ড্রিবলিং, স্ট্যামিনা, বুদ্ধি দিয়ে খেলবো—এ সবের সঙ্গে চরিত্রের যোগ কোথায়? ভিতরে ভিতরে ছটফট করে উঠলাম এক অসহ্য অসহায়তায়। ধরতে পারছি না, আমার অপোনেণ্ট যে কে, কী যে তার স্ট্র্যাটেজি, বুঝতে পারছি না।

হাল্কা হবার জন্য আমিই কথা শুরু করলাম, "টিউশনি থেকে আসছ বুঝি?"

"না, এক পাবলিশারের কাছে গেছলাম। প্রুফ দেখার কাজ শিখছি, বাবাই ঠিক করে দিয়েছেন।"

"অনেক টাকা পাওয়া যায়?"

নীলিমা মাথা হেলিয়ে পিছন থেকে বেণীটা সামনে টেনে আনল। বেণীর গোড়ার আলগা চুলগুলো আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল, "অনেক, এক লক্ষ, দু-লক্ষ টাকা।"

"ঠাট্টা করছ!"

"মোটেই না। কষ্ট করে সৎভাবে রোজগার করা একটা টাকা আমার কাছে এক লক্ষ্য টাকার সমান।"

"আমি এখনো রোজগার করতে পারলাম না। বাড়িতে একটা পয়সাও দিই না।" আমি হাসবার চেষ্টা করলাম। নীলিমাও আমার মতন হাসল।

"ফুটবল খেলে তো হাজার হাজার টাকা বছরে পাওয়া যায় শুনেছি। এটাও তো একরকমের কাজ, যেমন অফিসে, স্কুলে, কলেজে, কারখানায় লোকে কাজ করে। ফুটবলারকেও তো ওদের মতনই শিখতে হয়?" নীলিমা আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

"নিশ্চয়। আমি তো শিখতেই চাই।" এক মুহূর্ত ভেবে আবার বললাম, "জানো, এখন যে ক্লাবে খেলছি, সেখানে কিছুই শিখতে পারি না। ওরা আর এক বছর থাকতে বলছে। তাহলে কিছু টাকা দেবে, জুনিয়ার বেঙ্গল টিমে খেলিয়ে দেবে, এমনকি ইনডিয়া টিমেও। কী যে করি, ভেবে পাচ্ছি না। যদি না ওদের কথা শুনি, তাহলে এসব খেলা বন্ধ করে দেবে। শোভাবাজারের পরিমল ভটচাজের ভীষণ ইনফ্লুয়েন্স অল ইনডিয়ায়। ওকে চটিয়ে কোন ফুটবলার বড় হতে পারে না।"

নীলিমা কিছুক্ষণ কথা বলল না। দেখে মনে হল গভীরভাবে ভাবছে। আমি আবার বললাম, "হর্ষদা বললেন, এটা একটা চ্যালেঞ্জ।"

"আর কী বললেন?"

ইতস্ততঃ করে বললাম, "গাছ বেড়ে ওঠে শিকড়ের গুণে। শিকড় হচ্ছে চরিত্র, পচে গেলেই মানুষ মরে যায়।"

নীলিমা রাস্তার উপর থমকে ঘুরে দাঁড়াল। "প্রসূন, যারা চ্যালেঞ্জ নিয়ে বড় হতে পারে না, তারা বড় হবার যোগ্য নয়। প্রসূন, শিক্ষায় যে ফাঁকি দেয় না, সেই একমাত্র বড় হতে পারে। বড় হতে পারে না কাপুরুষেরা। তুমি কি কাপুরুষ, তুমি কি

পরিশ্রমে অনিচ্ছুক ?”

“না, তবে সব কিছুতেই ভাগ্য লাগে। পেলে-গ্যারিনচা থাকা সত্ত্বেও ব্রাজিল তো হেরেছে।”

“জানি না কে পেলে কে গ্যারিনচা, কেমন তারা খেলে, কিন্তু তাদের পাল্টা টিমেও তো ভালো প্লেয়ার থাকতে পারে। জ্যাঠামশায়ের ভাগ্য খারাপ, তাই পা নষ্ট করে অপমানিত হয়ে ফুটবল থেকে বিদায় নিয়েছেন। তোমার ভাগ্যে তা নাও হতে পারে। তাছাড়া তোমার উচিত নয় কি বাবার অপমানের শোধ নেওয়া ? যারা একদিন তার মুখে থুথু দিয়েছিল, তাদেরই সেই থুথু চাটতে বাধ্য করা ? বড় প্লেয়ার না হলে, বড় কিছু একটা না করলে তা পারবে কী করে ? কাউকে খুশী করে ইনডিয়া টিমে খেলতে পার, কিন্তু বড় প্লেয়ার হতে পার না।”

আমি শুধু তাকিয়ে রইলাম ওর বড় বড় চোখ দুটোর দিকে। যে পাষাণ ভারটা চেপে বসেছিল বুকে, সেটা সরে যাচ্ছে। হালকা ঝরঝরে লাগছে নিজেকে। বাবা, আমার বাবা গভীর মর্যাদাবান এক অপমানিত ফুটবলার। ফুটবলকে, হাজার হাজার দর্শককে, তার ক্লাব যুগের যাত্রীকে দিয়েছেন অনেক কিছু, বদলে কিছুই পাননি। দিনরাত এখন সংসারটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন চাবুক খাওয়া বলদের মতন। বাবা, আমার বাবা ক্লান্ত নিঃসঙ্গ অপমানিত এক ফুটবলার। আর আমি তার স্বার্থপর ছেলে।

“নীলিমা, তুমি আমার বাবাকে ভালবাসো! নিমাই আর আনোয়ার বাদে তুমি আর মা-ই আমার সব থেকে বড় বন্ধু।”

নীলিমা শোনামাত্র মুখ লাল করে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, “হয়েছে হয়েছে, ধার দেবার মতন পয়সা এখন আমার হাতে নেই।”

“একটা চানাচুরের দোকান পর্যন্ত যাবার ক্ষমতাও কি তোমার ব্যাগটার নেই ?”

॥ ১১ ॥

মোহনবাগানের সঙ্গে খেলাটার জন্য ছটফটিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। আনোয়ার-নিমাইকে আমি জানিয়ে দিয়েছি সামনের বছর ক্লাব বদল করবই। ওরা আমাকে অনেক বুঝিয়েছে, কিন্তু আমি ঘাড় নেড়ে গেছি গোঁয়ারের মতন। আমি বলেছি, বড় প্লেয়ার হতে চাই, আর কিছু নয়। সেজন্য যত ঝুঁকি নিতে হয় নেব। ওরা শুনে চুপ করে থেকেছে।

শনিবার মোহনবাগানের সঙ্গে খেলা আমার জীবনের প্রথম বড় ম্যাচ। প্রথম খেলা। বছরে দু-তিনবার মাত্র আমাদের মতন ছোট ক্লাবের জীবনে এত লোকের সামনে খেলার, চোখে পড়ার, খবরের কাগজে দু-এক লাইন উল্লেখ পাওয়ার সুযোগ আসে। আগের ম্যাচে জর্জ টেলিগ্রাফ দু'-গোলে হেরেছে, দুটোই আমার দেওয়া গোল।

শুক্রবার ক্লাবে এসে নোটিশ বোর্ড-এ তাকালাম। প্লেয়ারস্ লিস্ট টাঙানো রয়েছে। সোজা দশ নম্বরে চোখ রাখলাম। এ কী! এস দত্ত কেন? সাধন, সেই লম্বা সাধন, যে বলে কিক্ করলেই মাটির চাপড়া ওঠে, কেউ চার্জ করতে এলে বল জমা দিয়ে দেয়। আমার নাম কোথায়? লিস্ট-এর গোড়া থেকে চোখ বুলিয়ে আস্তে আস্তে পাথর হয়ে গেলাম। নিমাই আর আনোয়ারের নাম আছে।

বিপিনদার কাছে গেলাম। গম্ভীর মুখে উনি বললেন, "ওরা আমার রিকোয়েস্ট রাখবে বলেছে। ওরা নেমকহারাম নয়।"

শোভাবাজার টেণ্টটা আমার পায়ের নীচে কাঁপতে শুরু করেছে। আঘাত এসেছে। বুকের মধ্যে কে বলে উঠল, 'প্রসূন,

এইবার তুমি মাঠে নেমেছ। প্রথম গোল খেয়েছ। স্ট্রাইকার, বী রেডি, শোধ দিতে হবে। তারপরও উইনিং গোল দেওয়া চাই, চাই-ই!'

পরদিন আমরা ৬—০ গোলে হারলাম। গ্যালারিতে বসে ছিলাম। খেলা শেষে নিমাই আর আনোয়ার আমায় দেখে ফ্যাকাশে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

তারপর শোভাবাজার ইউনিয়ন টেন্টে আর যাইনি।

হর্ষদার এক বন্ধুর ভি আই পি রোডে বিরাট মোটর সারভিসিং ও পেট্রল ফিলিং স্টেশন। সেখানে তিনি আমাকে কাজ ঠিক করে দিলেন। সারভিসিং-এর জন্য নানান যন্ত্রপাতি—এয়ার কমপ্রেশার, ন্যুম্যাটিক গ্রীজ ও মোবিল পাম্প, হাইড্রলিক লিফট, ওয়াটার কমপ্রেশার, গ্রীজ ও ওয়াটার গান ইত্যাদি নিয়ে আলাদা বিভাগ। দৈনিক আড়াই টাকা মজুরিতে আমি মেট নিযুক্ত হলাম।

আমার কাজ সকাল আটটায় শুরু। H আকৃতির লিফটের উপর মোটরটা প্রথমে উঠানো হতো। তার তলায় দাঁড়িয়ে একটা লোহার খুন্তি দিয়ে মাড-গারড্ আর শ্যাশি থেকে শুকনো কাদা চেঁচে ফেলে ওয়াটার গান দিয়ে ধুয়ে দেওয়ার কাজ আমাকে দেওয়া হয়। হেড মেকানিক মধু সাহা খুঁটিয়ে আমার কাজ লক্ষ্য করে, তফাতে দাঁড়িয়ে। মাথায় একটা নীল টুপি আর নাকে ন্যাকড়া বেঁধে বেশ ভয়ে ভয়েই কাজ করি। মাঝে মাঝে মধু সাহা আঙুল তুলে হুঙ্কার দেয়, "ওই যে, ওই যে রয়ে গেছে, ডিফারেন-শিয়াল বক্সের তলাতে .....ছ্যাখ, চোখ দিয়ে টাইরডটার জয়েন্টটা ছ্যাখ।"

এখন সকালের প্র্যাকটিশ প্রায় বন্ধই। আমার ছটফটানি শুরু হয়ে গেল। ভোরে উঠে পাঁচ মাইল দৌড়ে আর আধ ঘণ্টা বল নিয়ে কসরৎ করে কাজে যাই। কিন্তু এইটুকুতে ভালো

প্র্যাকটিস তো হয়ই না, উপরন্তু কাজের সময় ক্লান্তি লাগে। মধু সাহার দাঁতখিঁচুনি শুনতে হয়। পাঁচটায় ছুটির পর বল-এ আর পা দিতে ইচ্ছে করে না। আমি রীতিমত ভাবনায় পড়ে গেলাম। এখানে চাকরি করলে আমার ফুটবল খেলা উচ্ছন্নে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে গাড়িতে পাম্প থেকে ডিজেল বা পেট্রল ভরে দেবার কাজটায় অনেক খাটুনি কম। যদি ওই কাজে বদলি করে দেয়, আর রাতের শিফট-এ, তাহলে সারাদিন সময় পাব। রাতে শুনেছি ঘুমোনোও যায়। যার তেল দরকার সে হাঁকাহাঁকি করে ডেকে তোলো।

হর্ষদাকে অসুবিধার কথা বললাম। শুনে বললেন, "আচ্ছা।" দুদিন পরে মালিক শিশিরবাবু তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন।

"তুমি ফুটবল খেলো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" তটস্থ হয়ে বললাম।

"তোমার অসুবিধে হচ্ছে খেলায় ?"

"খেলায় নয়, প্র্যাকটিসে। খেলা এখন বন্ধ রেখেছি।"

"কেন বন্ধ ?" ভ্রূ তুলে উনি জানতে চাইলেন। আমি ওকে সব বললাম। "আই সী, আই সী!" বলে কলমটা দিয়ে কপালে টোকা দিতে দিতে কী ভাবলেন। তারপর বললেন, "তুমি রাতেই যখন কাজ করতে চাও, তাই কোরো কাল থেকে।"

আমি হাঁফ ছাড়লাম।

আই এফ এ শীল্ডের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। শোভাবাজারের খেলা প্রথম রাউণ্ডে বার্নপুর ইউনাইটেডের সঙ্গে। টিকিট কেটে মোহনবাগান মাঠের গ্রীন গ্যালারিতে বসে খেলা দেখলাম। আর একজন মাত্র ছিল পূবদিকের প্রায় ১২ হাজার লোক বসার সেই গ্যালারিগুলোয়। খুব অবাক লেগেছিল লোকটিকে দেখে। টিকিট কেটে এই খেলা দেখতেও কেউ আসে! আমার কাছে প্লেয়ারস্ কার্ড ছিল, কিন্তু আমি চাই না নিমাই বা আনোয়ারের মুখোমুখি হতে। এখনো আমার কাছে ব্যাপারটা ধাঁধার মতন।

প্রসূন-নিমাই-আনোয়ার মানেই 'থ্রি মাসকেটিয়ারস্'। বহু টুরনামেন্টে আমরা ওই নামেই পরিচিত হয়েছিলাম। এক সঙ্গে খেলতাম, বেড়াতাম, আড্ডা দিতাম। গত ছ-সাত বছরে মনে পড়ে না এমন কোনদিন যে, আমাদের রোজ না দেখা হয়েছে।

অথচ আমি আলাদা হয়ে গেলাম ওদের থেকে। ছটফট করেছি দেখা করার জন্য, আবার সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছি, ওরা আমাকে না জানিয়ে চুপিচুপি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার মানে ওরা আমাকে আর চায় না। আমাদের মধ্যে তফাত ঘটে গেছে। আমার পথে ওরা ফুটবল নিয়ে এগোতে রাজী নয়। এক একবার মনে হয় ওরাই ঠিক করেছে। উপরে ওঠার মই কেউ এগিয়ে দিলে, তাতে উঠে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আমি চাই নিজে মই বানাতে। তফাতটা শুধু এই—আমি পরিশ্রম করতে চাই ওদের থেকে বেশি।

নিমাই বা আনোয়ারও আমার সঙ্গে দেখা করেনি। বোধহয় ওরা নিজেদের অপরাধী ভাবছে। আমাকে শোভাবাজার ইউনিয়ন বসিয়ে দিল অথচ ওরা তার প্রতিবাদ করল না! ভাবতেই মনে হল, ভালোই করেছে ওরা আমার সঙ্গে দেখা না করে। যদি জিজ্ঞাসা করি, কেন তোরা আমার পক্ষ নিলি না, কেন খেললি, তখন কী জবাব দেবে? তবু মনে মনে আমি আজও কষ্ট পাই ওদের অভাবে। কাজটা পেয়ে তবু কিছুটা ভুলে থাকতে পেরেছি। সকালে চার ঘণ্টা টানা মাঠে আর রাস্তায় খাটবার পর দুপুরে খানিকটা ঘুমোই। বিকেলে একটা ক্লাবে যাই একসারসাইজ করতে। রাতে বারোটার পর কদাচিৎ কোন গাড়ি আসে। ঘুমোবার জন্য অনেক সময় পাওয়া যায়।

॥ ১২ ॥

বার্নপুর ৩—১ গোলে জিতল। নিমাই চমৎকার খেলছিল। এখন আর ও থ্রু বাড়ায় না। বুঝে গেছে সেগুলো শুধু নষ্টই হবে। নিজেই বল নিয়ে এগোয়, গোলে মারে। দুজন ওকে পাহারায় রেখেছে, তবুও নিমাই মাঝে মাঝে বেরিয়েছে। একটা গোলও দিয়েছে। কিন্তু ঝরঝরে একটা টিমকে একজন-দুজন কি সামাল দিতে পারে? গোল খেয়েই বার্নপুর শোভাবাজারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি টিপে ধরল। আনোয়ার পর্যন্ত তিনটে ফাউল করল নিরুপায় হয়ে। হাফ টাইমে বার্নপুর ২—১ গোলে জিতছে।

এরপর বলটা একবার বার্নপুরের লেফট হাফের মিসকিক থেকে উড়ে এসে গ্যালারিতে পড়ে ড্রপ খেতে খেতে গ্যালারির নীচে ঢুকে গেল। বার করার জন্য অগত্যা আমাকেই গ্যালারির ফাঁক দিয়ে গলে নীচে নামতে হল। বলটা কিক করে মাঠে, পাঠাব বলে তুলে ধরেছি, দেখি, নিমাই এগিয়ে আসছে বলটা নিতে। আমি বল হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। ও আমাকে চিনতে পারামাত্র দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি বলটা ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, "ভালো করে খ্যাল্।" ওর মুখে একটা যন্ত্রণা ঝিলিক দিয়েই শুকনো হাসিতে রূপান্তরিত হল। এরপর লক্ষ্য করলাম, নিমাই আর খেলতে পারল না। বা ওর মধ্যে খেলার কোন ইচ্ছা দেখতে পেলাম না। খেলা শেষ হবার আগেই আমি মাঠ থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।

অরুণা গ্লাস ফ্যাক্টরির লক আউট সমানে চলেছে। খুব ভোরে কাজ থেকে বাড়ি ফিরি দৌড়ে মাইল পাঁচেক ঘুরে। রাস্তার লোকেরা আমার হাফ প্যান্ট-গেঞ্জি-কেডস্ পরা চেহারাটার সঙ্গে এখন যথেষ্ট পরিচিত, কেউ আর তাকায় না। বাড়িতে ঢুকি প্রায় চোরের মতন। বাবা ঘরে বসে পিন্টু আর পুতুলকে পড়ান এই সময়। আমার খুপরিতে ঢুকে ঢাকা খুলে চটপট রুটি ক'খানা শেষ করেই, বলটা নিয়ে বেরিয়ে যাবার পথে রান্নাঘরে মাকে একটা টাকা দিই। আমার নিজের রোজগারের টাকা। দেবার সময় দারুণ একটা আনন্দ হয়। বাকি দেড়টা টাকায় আমি বেছে বেছে এমন জিনিস কিনে খাই, যাতে বেশি ক্যালরি পাওয়া যায়। আমি সিনেমা দেখা বন্ধ করে দিয়েছি। টেরিলিনের জামা-প্যান্টের বয়স প্রায় দেড় বছর হল, সেলাই করে চালাচ্ছি। একজোড়া বুট না কিনলেই নয়। দু-তিনজন এসেছিল ডাকতে টুরনামেন্টে খেলবার জন্য, রাজী হলে বুটের কেন, জামা-প্যান্টের সমস্যাও মিটে যেত। আমি রাজী হইনি। সকালে যখন বল হাতে মাঠের দিকে যাই, তখন বই-খাতা হাতে মেয়েরা স্কুলে, কলেজে যায়, বাচ্চা ছেলেরা প্রাইমারি স্কুলে। তখন নীলিমার কথাটা মনে পড়ে আর নিজের মনেই বলি ঃ আমিও তো স্কুলে যাচ্ছি। আমার স্কুল মাঠে, আমার বই-খাতা এই বলটা।

বাবাকে একদিন সকালে দেখলাম মাথা নিচু করে অন্যমনস্কের মতন কোথায় চলেছেন। আমি আর পাড়ারই কয়েকটি ছেলে, কারখানার মাঠে তখন হেডিং প্র্যাকটিস করছিলাম। একটি ছেলে বলল, "প্রসূনদা, আপনার বাবা যুগের যাত্রীতে খেলতেন ?"

"হ্যাঁ, কোথায় শুনলি ?"

"মেজকাকা কাল বলছিলেন, দারুণ নাকি খেলতেন। দু-পায়ে টেরিফিক শট !"

"বাবার খেলা আমি দেখিনি। আমি জন্মাবার এক বছর পরই খেলা ছেড়ে দেন।"

লক্ষ করলাম আমার কথা শোনামাত্র দু-তিনজন নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে মুখ টিপে হাসল। প্রথমে বুঝতে পারিনি এর কারণ।

"আপনার বাবা শীল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলেছিলেন, তাই না?" একজন বলল।

"ওইটেই তো ওর জীবনের শেষ খেলা।" আর একজন বলল।

"কাকা বললেন, একবারে ফাঁকা একটা গোল মিস না করলে, ইস্টবেঙ্গল নাকি হেরে যেত। ও রকম গোল নাকি অন্ধেও দিতে পারে।"

"হ্যাঁ, পারে।" আমি বললাম রাগ চাপতে চাপতে ঠাণ্ডা গলায়, "তোমার কাকা জীবনে কখনো ফুটবল খেলেছেন কি?"

ছেলেটি থতমত হল।

"সম্ভবত খেলেননি।"

"আপনি জানলেন কী করে?" উদ্ধত চোয়াড়ে ভঙ্গিতে ছেলেটি বলল।

"খেললে কখনো বলতে পারতেন না যে, অন্ধেও গোল দিতে পারে।"

"অনেক ক্ষেত্রে পারে, কিন্তু ঘুষ খেলে পারে না।"

"তার মানে?" থরথর করে উত্তেজনায় আমি কাঁপছি। মাথার মধ্যে গলানো বাষ্প উড়ছে। আমি কিছু আর দেখতে পাচ্ছি না।

"তার মানে আবার কী! সবাই জানে ব্যাপারটা।" ছেলেটি ঠোঁট মুচড়ে দিতেই বাকিরা মুখ টিপে হাসল।

এরপর আমি আবিষ্কার করলাম আমি হাঁটছি। ছেলেটি পেট চেপে ধরে মাটিতে পড়ে বোধহয় এখনো কাতরাচ্ছে। ফাটা ঠোঁট দিয়ে রক্ত ঝরতে দেখেছি। লাথি মেরেছি না ঘুষি, এখন আর মনে নেই। আমি হনহনিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

ঘণ্টাখানেক পর বাড়ি ফিরছি, দেখি আমাদের সরু গলিটায় ভীড়। একটা লোক চেহারায় স্বচ্ছলতা, মাথায় টাক, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, আমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে মুঠো তুলে চীৎকার করছে, "আলবৎ বলবো, ঘুষখোর! ঘুষখোর! ঘুষখোর! আমিও সেদিন মাঠে ছিলাম, আমি নিজে চোখে দেখেছি। সেদিন—" লোকটির গলা ধরে এল, "সেদিন সেই চান্স!" দেখলাম লোকটি সিল্কের পাঞ্জাবির হাতায় চোখ ঘষল, তারপর ফ্যাসফেঁসে স্বরে বলল, "আজও আমরা শীল্ড পাইনি।"

আমি পায়ে পায়ে পিছু হটে গলি থেকে বেরিয়ে এলাম। আবার রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে বাড়ি ফেরামাত্র মা ছুটে এসে উঠোনের উপরই আমার চুল মুঠোয় ধরে ঠাস ঠাস চড় কষাতে শুরু করলেন।

"কেন, কেন তুই পরের ছেলেকে মেরেছিস। বাড়ি বয়ে তোর বাবাকে অপমান করে গেল। তুই, তুই, তোর জন্যই—"

মা হাঁফিয়ে পড়লেন। ছোট্ট নরম ঠাণ্ডা স্বল্পবাক্ হাসিখুশি মা। মা'র হাতে ব্যথা লাগছে। দু-চোখ বেয়ে দরদর জল পড়ছে। পিণ্টু, পুতুল গম্ভীর মুখে দূরে দাঁড়িয়ে। বাবার ঘরের দরজার পাল্লা ভেজানো। বিশুবাবুর মেয়েরা উপর থেকে দেখছে। পাশের বাড়ির জানলাগুলোয় অনেক মুখ। নীলিমা এসে মা'র হাত চেপে ধরতেই, দ্বিগুণ জোরে মা চেঁচিয়ে উঠলেন, "কুলাঙ্গার! কুলাঙ্গার! বাপের মান যে নষ্ট করে, তেমন ছেলের মুখ দেখাও পাপ।"

নীলিমা মাকে টেনে রেখেছে। আমি ভেজানো পাল্লা দুটো দড়াম করে খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। বাবা চিত হয়ে শুয়ে, চোখের উপর বাঁ হাত আড়াআড়ি রাখা। শব্দ হতেই হাত সরিয়ে একবার মাত্র তাকালেন।

"বাবা, তুমি ঘুষ নিয়েছিলে?" আমি উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করলাম।

বাবা কথা বললেন না, শুধু দেখলাম ওর গালের চামড়াটা একবার কেঁপে গেল।

"আমার জানা দরকার।"

"আমি তোমায় জানানোর কোন প্রয়োজন বোধ করছি না। যদি তোমার লজ্জা হয়, তাহলে পিতৃ-পরিচয় দিও না।"

"ওরা যা বলে আমি তা বিশ্বাস করি না।"

বাবা চুপ করে রইলেন। আমার দিকে একবারও তাকাননি। ওর শায়িত দেহটাকে হঠাৎ মনে হল ভাঙা একটা গাছের ডাল। শুকনো, মরা।

"আমার অনুরোধ, তুমি আর আমার জন্য কারুর সঙ্গে ঝগড়া করবে না। গায়ে হাত দেবে না। হাজার হাজার লোককে মারধোর করে তো তোমার বিশ্বাসকে তাদের মধ্যে সঞ্চার করতে পারবে না। তার থেকে আমি যেমন আছি, তেমনিই থাকতে দাও।"

বাবা চোখ থেকে হাত নামিয়ে আমার দিকে তাকালেন। কপালের মাঝখানে মসৃণ চামড়ার বাদামী টিপটা চকচক করছে। বড় বেশি চকচকে, চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

পরদিন মা রান্নাঘরে বসে উনুনে বাতাস দিচ্ছিলেন। আমি টাকাটা চৌকাঠে রেখে বেরিয়ে যাচ্ছি বল হাতে। মা ডাকলেন, কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বাচ্চা মেয়ের মতো মুখ উঁচু করে বললেন, "আমার হাতে কাল খুব লেগেছে।"

আমি হেসে ফেললাম। "লাগবেই তো। অত জোরে জোরে কখনো মারে?"

"তুই ভালো করে খেলবি? বল্, খেলবি?"

আমি একদৃষ্টে মায়ের অপূর্ব মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তারপর আমি মায়ের গলা জড়িয়ে বুকে মুখ চেপে ধরে বললাম, "খেলব"।

মা আমার মাথায় হাত রেখে ফিসফিস করে বললেন, "তোর বাবার মতন বড় হতে পারবি ?"

হঠাৎ আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। মাথায় মায়ের স্পর্শ, ঘ্রাণ পাচ্ছি মায়ের দেহের, মনে হচ্ছে মখমলের মতন সবুজ দূর্বা বিছানো মাঠে, হালকা সাদা-কালো ফুটকি দেওয়া বল নিয়ে ড্রিবল করছি। একের পর এক কাটাচ্ছি, দুলে দুলে এগোচ্ছি। ডাইনে ভাঙছি বাঁয়ে হেলছি, শূন্যে উঠছি—কখনো হরিণ, কখনো চিতা, কখনো চিলের মতন। নিজেকে বললাম—প্রসূন, সুন্দর খেলার আনন্দ বোধহয় এই রকম। বড় প্লেয়ার হও, তাহলে মাঠেও তুমি মায়ের বুকে থাকবে। তুমি কি তাই চাও ?

"হ্যাঁ, আমি তাই চাই।" আচ্ছন্ন গলায় মাকে উত্তর দিলাম।

॥ ১৩ ॥

বছর ঘুরে গেল। আমার এক বছর বয়স বাড়ল। মাথায় লম্বা হয়েছি পাঁচ ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি, ওজন তুলনায় কমই, ৬৫ কিলোগ্রাম। নীলিমা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। আমি এখন দিনে সাড়ে তিন টাকা পাচ্ছি, অবশ্য কাজটা রাতেই। অরুণা গ্লাস ফ্যাক্টরি এখনো খোলেনি; ১৪ মাস বন্ধ হয়ে রয়েছে। বাবা যথারীতি রোজ দুপুরে বেরোন। আরো শুকিয়ে গেছেন, আরো কম কথা বলেন। আমাদের রাত্রের রুটির বরাদ্দ একই রয়েছে, আমিষ খাদ্য বোধহয় বছরখানেক রান্না করার সুযোগ মা পাননি। দোতলায় বাড়িওয়ালার রান্নাঘর থেকে যেদিন মাংস কষার গন্ধ আসে, পিণ্টু আর পুতুল সেদিন প্রাণপণে পড়ার মধ্যে ডুবে যাবার চেষ্টা করে। হর্ষদা আমায় কয়েকবার বলেছিলেন—প্রসূন, এত যে খাটছো এতে শরীরে ক্ষয় হচ্ছে, সেই ক্ষয় পূরণ করে খাদ্য। ফুটবলারের ভীষণ দরকার প্রোটিন। মাংস, দুধ, ডিম

তোমায় খেতেই হবে, নয়তো বিপদে পড়বে। শুনে আমার ভয় হয়েছিল। শরীর ক্ষয়ে গেলে আমার আর রইল কী! কিন্তু মাংস আমি খাব, পয়সা কোথায়?

কাগজে দেখেছিলাম, বি-সি-রায় ট্রফি খেলার জন্য জুনিয়ার বেঙ্গল টিমের নাম ঘোষিত হয়েছে। একদিন ভোররাত্রে হাঁকাহাঁকি করে একটা লোক ঘুম ভাঙাল। পেট্রল চাই দশ লিটার, এখনি, ভোরের ফ্লাইট ধরতে হবে। মোটরের ভিতর তাকিয়ে আমার চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেল। পিছনের সিটে নিমাই আর আনোয়ার, সামনে বিপিনদা বসে। ওরা আমায় দেখে অবাক! বিপিনদা বললেন, "কী রে প্রসূন, খেলা ছেড়ে এখন এই কচ্ছিস? ভালো, ভালো! একটু তাড়াতাড়ি দে বাবা, দিল্লির ফ্লাইটে এদের তুলে দিতে হবে।"

আমি হাসলাম মাত্র। মোটরে পেট্রল ঢালছি মিটারের দিকে তাকিয়ে। বিপিনদা চেঁচিয়ে গাড়ি থেকে মুখ বার করে বললেন, "আমার কথা তো বিশ্বাস করলি না, এই ছাখ নিমাই, আনোয়ার জুনিয়ার ন্যাশনালে খেলতে যাচ্ছে। তুই থাকলে তুইও যেতিস। তোর এত পসিবিলিটি ছিল।"

বিপিনদা জিভটা টাকরায় লাগিয়ে চুকচুক শব্দ করলেন আক্ষেপের। টাকার ভাঙানি ফেরত দেবার সময় আমার মাথাটা মুখের কাছে টেনে এনে চাপা স্বরে উনি বললেন, "সামনের বছর আয়, দেড় হাজার দেবো, এদের থেকেও বেশি। নিজেকে এভাবে নষ্ট করিস না। এবার রেলিগেশন-প্রোমোশন আছে।"

আমি আবার হাসলাম। ওরা দুজন জড়ভরতের মতন বসে। আনোয়ার বাইরে তাকিয়ে, কিন্তু নিমাই একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে। গাড়িটা চলে যাবার পর আমার সত্যিই হিংসা হল। শোভাবাজারে থাকলে আজ আমিও এই মোটরে চেপে দিল্লির প্লেন ধরতে যেতাম। তারপর পরিমল ভটচাজ ঢুকিয়ে দিত জুনিয়ার ইনডিয়া টিমে, তারপর ব্যাংকক, সিওল কি টোকিওয়। শুধু

একটা বছর যদি থাকি।

নিজের উপর রাগ হল। বোধহয় বোকামিই করেছি, ক্ষতি করলাম নিজেরই। মুহ্যমান হয়ে খাটিয়ার উপর বসে যখন এই সব ভাবছি, তখন ফিসফিস করে বুকের মধ্যে কে কথা বলে উঠল : 'কী ক্ষতি করেছ, প্রসূন? পূরণ করে নেবার সময় অনেক পাবে। যাও যাও প্র্যাকটিসে নামো। খাটো, আরো খাটো। কিচ্ছু বোকামি করোনি। মনে রেখো, কদর পাবে একমাত্র খেলা দিয়েই, বেঙ্গল বা ইনডিয়ার ছাপ দিয়ে নয়।'

ভি-আই-পি রোড ধরে যখন দৌড়চ্ছি, একটা প্লেন মাথার উপর দিয়ে নিচু হয়ে পশ্চিমে চলে গেল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে ঊর্ধ্বশ্বাসে হঠাৎ পাগলের মতন ছুটতে শুরু করলাম।

॥ ১৪ ॥

"তোমার কথা রতন আমাকে বলছিল।" সাদা চুলে ভরা মাথাটা ডাইনে-বাঁয়ে নেড়ে ৬৫ বছরের দাস্তুদা অর্থাৎ দাস্তু গুহ গম্ভীরভাবে আমার আপাদমস্তক দেখলেন। তারপর চেয়ার থেকে উঠে এসে ধাঁ করে বুকে ঘুষি মারলেন। আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। লেগেছে ভালই, কিন্তু মুখে যন্ত্রণা ফোটালাম না। উনি আমার পিছনে গেলেন। বুঝতে পারছি না, এবার কী করবেন। হঠাৎ একটা ধাক্কা খেলাম। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলে নিলাম।

দাস্তুদার মুখে হাসি ফুটল। "স্ট্রাইকার?"

আমি মাথা হেলালাম। উনি চেঁচিয়ে ডাকলেন, "কমল, কমল!"

বেঁটে ফরসা কমল পণ্ডিত ছুটে এল। দাস্তুদা বললেন, "ছেলেটাকে পঁচিশ পাক দৌড় করা।"

কমলদা সোনালী সঙ্ঘের ট্রেনার। ইনডিয়া টিমে ব্যাক খেলেছেন বছর দশেক আগে। অসম্ভব দম আছে শুনেছি। "প্যাণ্ট এনেছ?"

"না।"

কমলদা প্যাণ্ট যোগাড় করে দিলেন। মাঠে হকি খেলা হচ্ছে। কিছু দর্শক ছড়ান ছেটানো। লক্ষ্য করলাম, ফুটবল বুট পায়ে খালি গায়ে তিন-চারটি ছেলে টেণ্টের বাইরে গান করছে। মনে হল, ওরা প্র্যাকটিসে নামবে হকি খেলাটা শেষ হলেই। ওরা কৌতূহলে আমার দিকে তাকাল। ওদের মধ্যে গোলকীপার রুনুকে মাত্র চিনলাম। দু-একবার শোভাবাজার টেণ্টে দেখেছি রতনের সঙ্গে। তবে আলাপ নেই।

কমলদা আমাকে নিয়ে দৌড়তে শুরু করলেন মাঠের বাইরে দিয়ে। জোরে হাঁটার থেকে কিছু জোরে। পাঁচ পাকের পর দেখি কমলদা আমার সামনে এবং গতি ক্রমশই বাড়াচ্ছেন। আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। আঠার মতন সঙ্গে লেগে রইলাম। সতেরো পাকের সময় হকি খেলা শেষ হতে দেখলাম, ফুটবল নিয়ে ওরা মাঠে নেমে পড়েছে। কুড়ি পাকের মাথায় কমলদাকে পিছনে ফেলে এগোতে শুরু করলাম। দাসুদা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওদের দিয়ে পাসিং ও ইনটার-পাসিং করাচ্ছেন, এখন তিনি আমাদের দৌড়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে। দম আমার বুক ভর্তি রয়েছে। কমলদা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছেন। শেষ পাকটা স্প্রিন্ট করলাম। কমলদাকে পুরো দেড় পাক পিছনে রেখে থামতেই দাসুদা হাত নেড়ে মাঠে মধ্যে ডাকলেন।

"তোর নামটা যেন কী?"

"প্রসূন।"

"বুট আনিসনি কেন?"

শুনেছি দাসুদা যাদের বুট আনতে বলেন, তারাই ফাস্ট টিমে খেলার যোগ্যতা পেয়েছে ধরে নিতে হয়। খুশিতে আমি

মাথা চুলকোতে লাগলাম। কমলদা তখন এসে আমায় জড়িয়ে ধরেছেন। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, "এই প্রথম আমি হারলাম দাস্থদা।"

"ছোঁড়ার দম আছে।" এই বলে দাস্থদা আবার প্র্যাকটিস করানোয় মন দিলেন। মাঠের বাইরে এসে আমি ওদের প্র্যাকটিস দেখতে লাগলাম। ডানদিক থেকে উঁচু ক্রশ পেনালটি বক্সে ফেলছে একজন, আর তিনজন ছুটে যাচ্ছে বলটা হেড বা ভলি করতে। ফসকাচ্ছে বা বারের অনেক উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে।

আমি গুটিগুটি মাঠের মধ্যে দাস্থদার পাশে দাঁড়ালাম।

"আমি একবার চেষ্টা করব?"

দাস্থদা মাথা দোলালেন। আমি এগিয়ে গেলাম।

একসঙ্গে তুজন ছুটেছি; বল নিয়ে ডাইনের সাইড লাইন ধরে ছুটে সেণ্টার করল একজন। সেণ্টারটা ভাল হয়নি, আমাদের তুজনের পিছনে বল পড়ছে। আমি ঘুরে গেলাম গোলের দিকে পিছন ফিরে। বলটা পড়ার আগেই ইনস্টেপ দিয়ে শূন্যে থামিয়ে টুক করে উপরে তুলেই সঙ্গে সঙ্গে পিছনে হেলে মাথার উপর দিয়ে বাইসাইকেল কিক করলাম। মাথা ঘুরিয়ে দেখি বারের তলায় লেগে বলটা গোলে ঢুকল, আর গোলকীপার হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে। নীলিমাকে এই কিক্‌ই দেখিয়েছিলাম আন্দাজে মেরে। কিন্তু এখন দশটার আটটাই গোলে পাঠাতে পারি।

দাস্থদা আর কমলদা নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন, অন্য ছেলেরা আমাকে সপ্রশংস চোখে দেখছে। একজন বলল, "আর একবার করো তো!"

করতে পারলাম না। বলটা পেলাম বুকের উপর, বুক থেকে উরুতে নিলাম, তুললাম ধাক্কা দিয়ে কিন্তু শরীর থেকে বাঁ ধারে বলটা একটু সরে গেল। বাইসাইকেল কিকের চেষ্টা না করে আধ পাক ঘুরে ডান পায়ে ভলি মারলাম। গোলকীপার তু-

হাত বাড়িয়ে ডানদিকে ঝাঁপাবার আগেই বল গোলে ঢুকে গেছে।

দাস্থদা হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে যাওয়া মাত্র জানতে চাইলেন, বাড়িতে কে কে আছেন, বাবা কী করেন, আমি কী করি, কতদূর লেখাপড়া করেছি···ইত্যাদি।

"কাজটা ছেড়ে দে!" দাস্থদা বললেন, তারপর আমার বিস্ময় লক্ষ্য করে যোগ করলেন, "ও টাকা আমরা দিয়ে দেবো তোকে মাসে মাসে, আর কিছু দিতে পারব না।"

আমি রাজী হয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গেই। ছোট টিমগুলোর মধ্যে সোনালী সঙ্ঘের নাম আছে ছক-বাঁধা আধুনিক পদ্ধতিতে খেলার। এখানকার ছেলেরা সিরিয়াস, মন দিয়ে প্র্যাকটিস করে দাস্থদার চোখের সামনে। কমলদা মাঠের মধ্যে ওদের স্কিল রপ্ত করান। সোনালীর নিয়ম-শৃঙ্খলা অত্যন্ত কড়া, সেটা শুধু মাঠেই নয়, বাড়িতেও প্রত্যেক প্লেয়ারকে পালন করতে হয়। দাস্থদা প্রায়ই এক একজনের বাড়িতে হঠাৎ হাজির হয়ে খোঁজ নেন, কী খাচ্ছে, কখন ফিরছে, কখন ঘুমোচ্ছে।

"সামনের হপ্তা থেকে ট্রান্সফার শুরু হবে, কমলের সঙ্গে আই-এফ-এ অফিসে গিয়ে সই করে আসবি। কাল ভোর থেকেই প্র্যাকটিসে আয়।"

ফেরার সময় শ্যামবাজারের বাসের দম বন্ধ করা ভীড়ের মধ্যে একবার আমার মনে পড়ল, দাস্থদা যখন জিজ্ঞাসা করলেন বংশে কেউ কখনো ফুটবল খেলেছে কিনা, তখন আমি 'না' বলেছিলাম।

॥ ১৫ ॥

আই-এফ-এ অফিসে সই করতে গিয়ে বিপিনদার সঙ্গে দেখা। সুতারকিন স্ট্রীটে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু থেকে আনন্দবাজার পত্রিকা অফিস পর্যন্ত হাজারখানেক লোকের জটলা। তার মধ্যে বিপিনদা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে হাত তুলে থামতে ইশারা করলেন। আমি অস্বস্তি বোধ করলাম।

"সোনালীতে সই কচ্ছিস খবর পেয়েছি।"

"আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"উইথড্র করাব আজ নিমাই, আনোয়ারকে। ওরা দুটোর সময় আসবে।" বিপিনদা ঘড়ি দেখলেন। তুই তাহলে আমার কথাটা ভেবে দেখলি না? এরা কত দেবে?"

"এক পয়সাও নয়।"

বিপিনদা অবাক হয়েই, 'অ' বলেই সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেলেন। ঠিক দুটোয় আনন্দবাজারের গেটের সামনে কমলদার থাকার কথা। আমি সেদিকে এগিয়ে গেলাম। একদল ছেলে খুব উত্তেজিত হয়ে তর্কাতর্কি করছে। বিষয় নঈম, অরুণ ঘোষ, অসীম মৌলিক, পাপান্না, হাবিব, ধীরেন দে, জ্যোতিষ গুহ, মান্না। হঠাৎ কী যেন হল, ওরা ছুটে গেল আই-এফ-এ অফিসের দিকে 'নঈম নঈম' বলে। একটু পরেই ফিরে এল, 'যত্তোসব উড়ো গুজব' বলতে বলতে। আমি ভাবলাম, আমার জন্য এরাও একদিন এখানে এইভাবে অপেক্ষা করবে। আমি দল বদলাতে আসছি শুনে ছুটে যাবে। অথচ এরা জানে না, আমি এখন এদের পাশেই দাঁড়িয়ে। ভাবতেই আমার খুব হাসি পেয়ে গেল।

কমলদার সঙ্গে যখন আই-এফ-এ অফিসের সিঁড়ি দিয়ে উঠছি,

তখন নিমাই আর আনোয়ার বিপিনদার পিছনে নামছে। আমি দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পথ দিলাম। নিমাই চমৎকার ঘিয়ে রঙের একটা প্যাণ্ট পরেছে। ভীষণ টাইট, কোমরের অনেক নীচে নামানো। জুতোর মুখটা ছুঁচলো। চুল আঁচড়াবার ঢঙটাও বদলেছে, কপালের আধখানা জুড়ে চুল নামানো। আনোয়ার পরেছে একটা নীল নাইলনের স্পোরটস্ গেঞ্জি, ফরসা রঙের সঙ্গে সুন্দর মানিয়েছে।

"কেমন আছিস," আমি বললাম।

ওরা থতমত হল, আশা করেনি আমি কথা বলব।

নিমাই তাড়াতাড়ি বলল, "তুই রোগা হয়ে গেছিস প্রসূন।"

আমি হাসলাম।

"পরে কথা বলব, এখন চলি।" আনোয়ার মৃদু স্বরে বলল। আমি মাথা কাত করলাম।

পরদিন সন্ধ্যায় মাঠ থেকে ফিরতেই মা দারুণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "এ ঘরে আয় শিগ্গিরী, একটা জিনিস দেখাব।" আমি ছুটে গেলাম। মা'র হাতে পাঁচটি একশো টাকার নোট।

"কোত্থেকে পেলে?" প্রশ্ন করলাম অবাক হয়ে। মা একটা চিঠি হাতে দিলেন। চিঠিতে লেখা: "প্রসূন, কাল ঠিক দুটোর সময় আমি অপেক্ষা করব আই-এফ-এ অফিসের কাছে, যেখানে তোর সঙ্গে গতকাল দেখা হয়েছিল। ইতি, বিপিনদা।"

মা'র হাত থেকে নোটগুলো নেবার জন্য হাত বাড়ালাম।

"এ টাকা এখুনি ফেরত দিতে হবে। এটা ঘুষ।"

মা'র হাত থেকে নোটগুলো পড়ে গেল। মনে হল যেন ফেলে দিলেন। ফ্যাকাশে মুখে শুধু বললেন, "ঘুষের টাকা!"

বিপিনদার বাড়ি পৌঁছলাম রাত দশটায়। অবাক হয়ে বললেন, "এত রাতে, ব্যাপার কী রে?"

নোটগুলো ওর টেবিলে নামিয়ে রেখে বেরিয়ে আসার সময় বললাম, "কয়েক ঘণ্টার জন্য টাকাটা আমার কাছে থেকে গেছল। সেজন্য সুদ আপনার প্রাপ্য। শোভাবাজারের সঙ্গে যেদিন খেলা থাকবে, সেদিন সেটা শোধ দেবো।" বলে দরজা পেরোচ্ছি, পিছনে বলতে শুনলাম, "বটে!"

॥ ১৬ ॥

লীগের তৃতীয় ম্যাচ শোভাবাজারের সঙ্গে। এরিয়ানের সঙ্গে ২—২ করে, উয়াড়িকে ৩—০ হারিয়েছে সোনালী। পাঁচটা গোলই আমার, লীগে প্রথম হ্যাটট্রিকও। যুগান্তরে লিখেছে, "সোনালী সঙ্ঘের নবাগত ফরোয়ার্ড পি ভট্টাচার্য সুযোগসন্ধানীরূপে পরিচয় দিয়ে গুনে গুনে তিন-তিনটি গোল দিয়ে মরশুমের প্রথম হ্যাটট্রিক লাভের গৌরব অর্জন করেন।" পিণ্টু কাগজ থেকে কেটে রেখে দিয়েছে। ও প্রায়ই এখন বায়না ধরে আমার খেলা দেখার জন্য। যদি খারাপ খেলি ওর সামনে, এই ভয়ে ওকে কখনো মাঠে আনিনি। ও আমার সব থেকে বড় ভক্ত। কিন্তু আজ ওকে এনেছি, আজ আমি কনফিডেণ্ট, ভাল খেলবই।

আনোয়ার দূর থেকে হাত তুলল। আমিও হাত তুললাম। তখন খেলার আগে ওয়ারমিং আপ চলেছে। আনোয়ার জগ করতে করতে আমার কাছে এসে বলল, "খুব গোল দিচ্ছিস, আজ পারবি না।"

"জুনিয়ার ইনডিয়া ক্যাম্পে তোর আর নিমাইয়ের নাম আছে দেখলাম।"

আনোয়ার হেসে চলে গেল। নিমাই আমাদের দিকে এল না। রতন একবার বল কুড়োতে এসে বলে গেল, "সাবধানে থাকবে আজ।"

"কেন ?"

"বললুম ।"

রতন চলে যাবার পর আমি ওর কথার মানে বোঝার চেষ্টা করেও কোন হদিশ পেলাম না। অবশেষে বুঝলাম হাফ টাইমের মিনিট তিনেক আগে। শোভাবাজার পেনালটি বক্সের মধ্যে আমাদের রাইট আউট ব্যাক সেন্টার করতেই ছুটে গেলাম। আমার সঙ্গে টিকাদারও। বলটা দু' গজ দূরে ড্রপ পড়ে উঠছে, কি করব ? ভলি মারলে বারের দশ হাত উপর দিয়ে যাবে। একমাত্র উপায় ডাইভ দিয়ে হেড। সামনে গোলকীপার বেরিয়ে আসছে, আনোয়ারের বুটের ধপ্ধপ্ বাঁদিকে, আমি ঝাঁপ দিলাম।

মাথায় বলের স্পর্শ পাবার সঙ্গে সঙ্গে, ডান পাঁজরে প্রচণ্ড একটা যন্ত্রণা ছুরির ফলার মতো বিঁধল। টিকাদার লাথি কষিয়েছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে, চোখে অন্ধকার দেখছি। তার মধ্যেই রেফারীর লম্বা হুইশল শুনতে পেলাম।

সাইড লাইনের বাইরে আমাকে শোয়ানো হল। জারসি খুলে বুকে বরফ ঘষা হচ্ছে। চোখ খুলতেই পিন্টুর কাঁদো-কাঁদো মুখটা প্রথমে চোখে পড়ল। হাত তুলে ওকে আশ্বাস দিতে গিয়ে খচ্ করে বুকে যন্ত্রণা উঠল। হাসলাম শুধু। দাসুদা, কমলদা ঝুঁকে রয়েছেন। এখন হাফ টাইম।

"গোলটা হয়েছে ?" আস্তে উচ্চারণ করলাম।

"হ্যাঁ।" কমলদা বললেন।

"কেউ নেমেছে নাকি ?"

"সুশান্ত নামছে।"

"বারণ করুন, আমি খেলব, আমি পারব।" ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। "আমার কিছু হয়নি।"

"তোকে খেলতে হবে না প্রসূন।"

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। আনোয়ারের টকটকে রাঙ্গা মুখ চোখে পড়ল। "আবার লাগলে সিজনের মতো বসে যাবি।"

রাগে আমি জ্বলে উঠলাম। "সেই ব্যবস্থাই তো তোরা করেছিস। কাওয়ার্ড।"

আনোয়ারের চোখ দুটো দপ্ করে উঠল, কথা না বলে চলে গেল।

"খেলতে পারবি? আমার আপত্তি নেই যদি খেলতে চাস।" দাস্থদা বললেন।

"কিন্তু দাস্থদা—" কমলদা থেমে গেলেন দাস্থদার তোলা হাতটাকে দেখে। পিণ্টু ফিসফিস করে বলল, "আনোয়ারদা একা দু' হাতে তোমায় মাঠ থেকে তুলে আনল। কী গায়ের জোর!"

মাঠে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। বল এখন আমাদের ডিফেনডিং জোনে। নিমাই যথেচ্ছ কাটাচ্ছে, একটার পর একটা বল বাড়াচ্ছে আর শোভাবাজারের ফরোয়ার্ডরা প্রত্যেকটা নষ্ট করছে। শেষে নিমাই শোধ করল গোলটা। আমি জানি ও করবেই। ওকে রোখার সাধ্য সোনালীর ডিফেনসের নেই। আমাদের আটজন পেনালটি বক্সের মধ্যে। এক ছুটের উপর তিনজনকে কাটিয়ে শরীরটাকে ডানদিকে-বাঁদিকে করিয়ে ছোট্ট একটা চীপ, বেটাল গোলকীপারের ফ্যালফ্যালে চোখের উপর দিয়ে বলটা গোলে ঢুকে গেল।

আমি দু'একবার ছোটার চেষ্টা করে বুঝলাম, পারব না। টিকাদার ছায়ার মতো সঙ্গে রয়েছে। তবু চেষ্টা করলাম। রাইট হাফ উঠে এসেছে। ওর সঙ্গে ওয়াল পাস করে বক্সের মাথায় পৌঁছলাম। রাটই স্টপার ব্যাক ট্যাকল করতে এল। কাটালাম। লেফট হাফ সামনে। ঠেলে দিলাম বলটা বাঁদিকের ফাঁকা জায়গায়। আমাদের লেফট আউট উঠে আসছে দেখছি। আনোয়ারের পিছনে চমৎকার জায়গা পড়ে আছে, ওখান থেকে গোল দশ গজ। ছুটে গেলাম সেখানে। লেফট আউট দিল আমাদের লেফট ব্যাককে। বল ধরে ও কাকে দেবে খুঁজছে, আমি হাত নাড়তেই

ঠেলে দিল। শোভাবাজারের চারজন আমার দিকে ছুটে এল।

বলটা ঠিকমত থামাতে পারলাম না। ছিটকে বেরিয়ে গেল পা থেকে। আনোয়ার ছুটে এসে পড়েছে। এবার সোজা গ্যালারিতে পাঠিয়ে দেবে, তাছাড়া উপায় নেই। তবু একবার শেষ চেষ্টা করলাম। আনোয়ার বলটা মারবার জন্য পা তুলে থমকে গেল। হুড়মুড়িয়ে আমি আর টিকাদার বলের জন্য এগিয়ে গেলাম।

"ওরে বাপ্‌স।"

একটা চাপা আর্তনাদ উঠল। আনোয়ার আর টিকাদার মাটিতে পড়ে। বলটা গড়াচ্ছে। ছুটে গিয়ে ধরলাম বলটা। গোল মাত্র পাঁচ-ছ গজ দূরে। একটা টোকা দিয়ে বাকি কাজটা সেরে ফিরে তাকিয়ে দেখি, টিকাদার তলপেট চেপে কাটা পাঁঠার মতো ছটফটাচ্ছে। আমি আনোয়ারের মুখের দিকে তাকালাম।

"কী করলি ?"

"বেশ করেছি, তোর কী ?"

বিপিনদা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন মাঠের মধ্যে চীৎকার করতে করতে ঃ "সাসপেণ্ড করব তোকে। নিজের প্লেয়ারকে মারলি, জানোয়ার কোথাকার। বন্ধুত্বের প্রতিদান হল, সব বুঝি, সব বুঝি।"

আমি লজ্জা পেয়ে সরে গেলাম। রতন আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল, এমন একটা ব্যাপার যে হবে তা সে জানত। টিকাদারকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাবার পর শোভাবাজার আর খেলতে পারল না। আমাদের রাইট আউট পর পর দুটো গোল করল। দাসুদা হাত নেড়ে আমাকে মাঠ থেকে চলে আসতে বললেন।

রাত্রে আমার বুকে ব্যথা শুরু হল। মাকে ডাকলাম। পিণ্টু বাড়ি এসে মাকে নিশ্চয় মাঠের কথা বলেছে, নয়তো মা প্রথমেই ক্ষুব্ধ স্বরে বলবেন কেন, "কী দরকার ছিল অমন করে ডেনজারাস্‌লি গোল দেবার ? বুকে লাথি খেতে হয় যেখানে, দরকার কি সে-

কাজ করার ?”

মা’র মুখে ইংরিজি শুনলে হাসি পায় আমার। আসলে পিন্টুর কথাই মা’র মুখ দিয়ে বেরোল। বললাম, “গোল ডেনজারাস্‌লিই পেতে হয়।” গজ গজ করতে করতে মা সরষের তেল গরম করে আনলেন। বুকে মালিশ করতে করতে একবার শুধু বললেন, “ফুটবলই আমার সর্বনাশ করবে।”

॥ ১৭ ॥

সকালে বুক টাটিয়ে উঠল। আমার শুধু একটাই ভয়, এত পরিশ্রম করলাম সারা বছর, বুঝি বিফলে গেল। চোট পেয়েছি জানলে দাস্থুদা বসিয়ে দেবেন। অথচ বড় ম্যাচ একটাও খেলা হল না এখনো। পরশুই খিদিরপুরের সঙ্গে খেলা। আজ কি কাল ক্লাবে না গেলে নিশ্চয় কেউ খোঁজ করতে আসবে, জেনে যাবে চোট পাওয়ার কথা।

ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম দাস্থুদা কি কমলদাকে জানিয়ে দিই যে, আমি কলকাতায় নেই। মাসির বিয়েতে মামাবাড়ি চলে গেছি। কিন্তু কাকে দিয়ে খবর পাঠাব! পিন্টু ছাড়া আর কেউ নেই। কালীঘাটে দাস্থুদার বাড়ি কি গড়িয়ায় কমলদার বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার মত ডাঁটো এখনো সে হয়নি। দাস্থুদার টেলিফোন আছে, নম্বরটা জানি না। ওর ভাল নামটাও জানি না। হর্ষদা জানতে পারেন। পিন্টুকে হর্ষদার কাছে পাঠিয়ে দিলাম, আর সাবধান করে দিলাম, একদম যেন চোট পাওয়া সম্পর্কে একটি কথাও না বলে, তাহলে আর কোনদিন মাঠে নিয়ে যাব না।

পিন্টু টেলিফোন নম্বর আনল। এবার সমস্যা কাকে দিয়ে টেলিফোন করাব। নীলিমাকে ডাকলাম, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতেই ও গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল এবং টেলিফোন নম্বর নিয়ে

বেরিয়ে গেল। আধ ঘণ্টা পর নীলিমা ফিরল। ওর সাড়া পেয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে হৃদ্‌পিণ্ডটা ধ্বক্ করে গলায় আটকে গেল। দুই মূর্তি দাঁড়িয়ে, আনোয়ার-নিমাই।

ওদের দেখাচ্ছিল খুবই ব্যস্ত আর সিরিয়াস। আনোয়ার মোটা মোটা আঙুলগুলো আমার বুকে রেখে আলতো চাপ দিল। আমার মুখে যন্ত্রণা ফুটে উঠতে দেখে নিমাইয়ের দিকে তাকিয়ে মাথা কাত করল। নিমাইও গম্ভীর হয়ে মাথাটাকে দু'বার উপর-নীচ করল। তারপর দুজনে ফিসফিস কি কথা হল, নিমাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আনোয়ার মাকে বলল, "মাসিমা, ওকে জামা পরিয়ে দিন, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।"

আমি একটাও কথা বলিনি। শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাকে কোন পাত্তা না দিয়ে বিছানায় বসিয়ে দিল। মা আমাকে জামা পরিয়ে দিতে আনোয়ার বলল, "হাঁটতে পারবি?" আমি মাথা নাড়ালাম। নিমাই ট্যাক্সি এনেছে। দু' পাশে দুজনে ধরে আমাকে ট্যাক্সিতে তুলল। আমরা শ্যাম-বাজারের দিকে রওনা হলাম।

হাড় ভাঙেনি। এক্স-রে না করলে চিড় খেয়েছে কিনা বোঝা যাবে না। ডাক্তার কষে ব্যানডেজ করে দিল বুকটা। শুয়ে থাকতে হবে, নড়াচড়া বারণ। ট্যাক্সিতে ফিরে এলাম। ওরা কেউ আমার সঙ্গে কথা বলল না, আমিও বললাম না। পৌঁছে দিয়ে, মা'র সঙ্গে কথা বলেই ওরা চলে গেল। নীলিমাকে দেখামাত্র রেগে বললাম, "কে তোমাকে সর্দারি করে ওদের ডাকতে বলেছে?"

নীলিমা উত্তর দিল, "টেলিফোন করেছি। বলেছি দিন পনেরো মামাবাড়ি থাকবে।" এই বলে গম্ভীরভাবে ও আঙুলের ইশারায় আমাকে শুয়ে থাকতে বলে বেরিয়ে গেল।

এক্স-রে রিপোর্টে কিছুই পাওয়া গেল না।

খিদিরপুর, ইস্টার্ণ রেল, মহামেডান, কালীঘাট, রাজস্থান—পাঁচটা ম্যাচ শুয়ে রইলাম বাড়িতে। তিনটে হেরেছি, দুটো ড্র। এরপর আর শুয়ে থাকা গেল না। একদিন সকালে অল্প দৌড়লাম, সামান্য ব্যায়ামও করলাম, কোন অসুবিধা বোধ হল না। বিকেলে টেন্টে গেলাম। পরদিনই স্পোরটিং ইউনিয়নের সঙ্গে খেলা। এতদিন মামাবাড়িতে থাকার জন্য দাসুদা মৃদু বকুনি দিলেন এবং জানালেন, টিম হয়ে গেছে। তবে আমি খেলছি। আমার জায়গায় যাকে নামানো হয়েছিল, সে একদম সুবিধা করতে পারছে না।

সাবধানে, ঝুঁকি না নিয়ে প্রায় দাঁড়িয়েই খেললাম। জিতলাম ৩—০। পেনালটি বক্সের মাথায় বল পেয়ে দুটো শট থেকে গোল করলাম। পরের ম্যাচ বি এন আর-এর সঙ্গে। এবার অরুণ ঘোষের মুখোমুখি হয়ে নিজেকে যাচাই করব, এই ভেবে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু মাঠে এসে যখন শুনলাম অরুণ ঘোষ খেলছে না, তখন বেশ ক্ষুণ্ণ হই। মনে হল, অরুণ ঘোষ আমাকে বঞ্চিত করলো। নয় মিনিটের মধ্যে দুটো গোল দিয়ে মাঠকে অবাক করে দিলাম। ছোট টিম সোনালী শুরু থেকেই ডিফেনসিভ খেলবে, বোধহয় এই রকম একটা ধারণা করেছিল বি এন আর। বদলে আমরা সোজা তাদের গোলের দিকে এগিয়ে যাই। পাঁচ মিনিটের পর রাইট আউটের ক্রশ করা বল গোলকীপার এগিয়ে এসে পাঞ্চ করে সামনে ফেলতেই ছুটে এসে ভলি মেরে নেটে পাঠিয়ে দিলাম। দ্বিতীয় গোল একইভাবে। এরপর বি এন আর গুছিয়ে নিয়ে আমাদের কোণঠাসা করলেও আর গোল দিতে পারেনি। আমাদের গোলকীপার রবি নিশ্চিত চারটে গোল বাঁচিয়েছিল।

পরের ম্যাচে যুগের যাত্রীর সামনে পড়লাম আমরা। লীগে যাত্রী এখন সবার উপরে, একটাও পয়েন্ট নষ্ট করেনি। মোহনবাগান হেরেছে ইস্টার্ণের কাছে, ইস্টবেঙ্গল ড্র করেছে

রাজস্থানের সঙ্গে। এ বছর পাঁচটা ম্যাচ খেলেছি মাত্র, কিন্তু তাতেই ময়দানের আনাচে-কানাচে, অনেক টেণ্টে আমাকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। সামনের বছর কোন্ ক্লাব আমাকে তুলে নেবে, কত দর হবে, এসব কথাও নাকি বলাবলি হচ্ছে। লীগের টপ স্কোরার এখন আমি—পাঁচটা ম্যাচে ১১ গোল। অসীম মৌলিক ১০টা ম্যাচে ১০ গোল, অশোক চ্যাটার্জি ১১টা ম্যাচে ৮ গোল।

॥ ১৮ ॥

নীলিমা স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে সেকেণ্ড ডিভিশনে। বাড়িতে হৈ হৈ পড়ে গেছে সকালেই। তখনো আমি বিছানা ছেড়ে উঠিনি। বাড়িওয়ালা বিশু দত্ত চেঁচাচ্ছে : "নুটুবাবু, খাওয়াতে হবে।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, কি খাবেন বলুন!"

"রাবড়ি। বড়বাজারের রাবড়ি।"

ঘরের বাইরে এলাম। দেখি নীলিমা প্রণাম করছে মাকে। তারপর আমাদের ঘরে ঢুকল। বাবা আছেন ঘরে। মা ফিসফিস করে আমাকে বললেন, "তোর কাছে টাকা আছে, একটা শাড়ি কিনে দিতুম! আহা কত কষ্ট করে লেখাপড়া করেছে।"

"বাবার কাছে নেই?"

"এই মাসটা চালাবার মতন আছে।"

"আমার কাছে টাকা বারো আছে। তাই দিয়ে কি শাড়ি হবে?"

মা ভেবে বললেন, "থাক্ তাহলে পরে দেবোখন।"

"জ্যেঠিমা, প্রসূন আমার থেকে কত বড়?" নীলিমা ঘর থেকে বেরিয়ে বলল, "ছ' মাসের বেশি কি?"

প্রাইভেটলি বলতে চাই।"

লোকটার চালচলন আমার বিশ্রি লাগছে, তার উপর 'প্রাইভেটলি' কথা বলার প্রস্তাবটা ভাল লাগল না। বললাম, "আপনার প্রাইভেট কথা এখানে দাঁড়িয়েও বলতে পারেন, কেউ শুনতে পাবে না।"

লোকটা এধার-ওধার তাকিয়ে, গলা খাঁকারি দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "কালকের ম্যাচটা তুমি খেলো না।"

"যাত্রীর সঙ্গে খেলব না?" আমি প্রায় চীৎকার করে উঠলাম। "বলছেন কী আপনি!"

"তুমি কত টাকা আর পাও সোনালী থেকে, মাসে মাসে একশো···খবর রাখি, সব ক্লাবেরই খবর রাখি।" লোকটা হঠাৎ পকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বার করে আমার হাতটা টেনে মুঠোয় গুঁজে দিল। "খেলতে চাও যদি, নিশ্চয়ই খেলবে। কুড়ি-পঁচিশ বছর কলকাতায় কোন বড় ট্রফি আমরা পাইনি, এবার ভাল চান্স এসেছে লীগ পাবার, কাল তুমি ব্যাগড়া দিও না ভাই।"

আমি তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠিনি। বললাম, "আমি ব্যাগড়া দেবো?"

"ভয় তোমাকেই প্রসূন। কলকাতার সব ক্লাব এখন তোমাকে ভয় করে; মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান সবাই। কাল তুমি গোল দিও না।"

এতক্ষণে আমি সম্বিৎ ফিরে পেয়েছি। একশো টাকার নোট লোকটার বুক পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বললাম, "এখন থাক্। আপনি আমাদের বাড়িতে আসুন, আমার বাবার হাতে এটা দেবেন।"

লোকটা ইতস্ততঃ করে বলল, "তোমার বাবা কি করেন?"

"বেকার। একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। লক আউট হয়ে বন্ধ।"

মা হেসে বললেন, "ওই রকমই হবে।"

এরপরই একটা ভয়ঙ্কর অপ্রতিভতার মধ্যে নীলিমা আমাকে ফেলে দিল। গোল থেকে এক গজ দূরে বল পেয়ে গোলের বাইরে মারলে মাঠভর্তি লোকের সামনে যা হয়, সেই রকম বোঁ বোঁ করে উঠল মাথাটা। নীলিমা প্রণাম করেছে আমায়। পাশ করলে দেখছি কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়! আমি আমতা আমতা করে কি সব বলতে বলতে ঘরে পালিয়ে এলাম। শুনলাম নীলিমা বলছে, "প্রসূন যত মন দিয়ে প্র্যাকটিস করে, আমি যদি সেভাবে পড়তাম তাহলে স্কলারশিপ পেতাম।"

উঁকি মেরে দেখলাম, নীলিমা বালতি হাতে কলঘরে যাচ্ছে। ওকে ডাকলাম।

"এবার তো কলেজ?"

"হ্যাঁ। টাকা যোগাড় করতে হবে, প্রায় একশো।"

মনে মনে সিঁটিয়ে গেলাম। যদি এখন এতদিনের ধারের টাকা চেয়ে বসে! তাড়াতাড়ি বললাম, "তোমাকে কিছু একটা উপহার দিতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু হাতে এমন টাকা নেই যে কিনতে পারি।"

নীলিমা কিছু বলতে যাচ্ছে, এমন সময় পিণ্টু ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল।

"দাদা, একটা লোক তোমায় ডাকছে। বলল, খুব দরকার।"

গলিতে বেরিয়ে দেখি, রঙীন বুশ শার্ট গায়ে, ফরসা, কটা চোখ, বছর চল্লিশের একটি লোক দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই খুব পরিচিতের ভঙ্গিতে বলল, "প্রসূন, একটা কথা ছিল, চলো একটু বাইরে গিয়ে বলব।"

রাস্তায় এসে বললাম, "যা বলবার এখানেই বলুন, আমি আর যাব না, কাজ আছে।"

একটা ফিয়াট গাড়ি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে লোকটা বলল, "চলো না একটু ঘুরে আসি, মোটরে বসেই বলব। কথাটা খুবই

"তাহলে তো তোমরা বেশ অসুবিধের মধ্যে রয়েছ।" লোকটা বুক পকেটে হাত দিয়ে বেশ খুশি হয়েই বলল, "তোমার উচিত সংসারকে হেল্‌প করা।"

আমি কথা বললাম না। লোকটাকে নিয়ে সটান বাবার সামনে হাজির করলাম। নীলিমা তখন বাবার কাছে বসে কলেজে ভর্তি হওয়ার অসুবিধা নিয়ে কথা বলছে। আমি কোন ভূমিকা না করে বললাম, "বাবা, কাল যুগের যাত্রীর সঙ্গে আমাদের খেলা। কাল আমি যেন না খেলি বা খেললেও যেন গোল না দিই, এই কথা ইনি বলছেন আর একশো টাকা আমায় দিতে চাইছেন।"

আচমকা এমনভাবে বললাম যে, শুধু বাবা আর নীলিমাই নয়, কটা চোখ লোকটাও আড়ষ্ট হয়ে গেল। অবশেষে বাবা মৃদু স্বরে বললেন, "কোন্ ক্লাবের সঙ্গে খেলা?"

"যুগের যাত্রী।" আমি বললাম। মনে হল বাবার চোখ ঝলসে উঠল। ওর কপালের উপর আমি অবধারিত চোখ রাখলাম।

বাবা মাথা নিচু করে বললেন, "আমি জানি না। আমি কোন কথা বলব না। তুমি নিজেই ঠিক করো ঘুষ তুমি নেবে কিনা।"

বাবা মাথা তুলে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমার বুক কাঁপতে শুরু করেছে। নীলিমা কি যেন বলবার চেষ্টা করছে আর আমি কি যেন একটা করতে চাইছি। আর মনের মধ্যে তখন কার কণ্ঠস্বর শুনলাম, "প্রসূন, দ্যাখো দ্যাখো তোমার বাবার অপমানিত কপাল। ওখানে বিজয় তিলক এঁকে দেবে তুমি, হ্যাঁ তুমিই।"

"কাল যাত্রীকে আমি হারাবোই", দাঁতে দাঁত চেপে বললাম। তারপর লোকটার দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড চীৎকার করে বললাম, "গেট আউট।"

লোকটা অবাক হল মাত্র, কিন্তু ঘাবড়াল না। যাবার সময় মুচকি হেসে বলে গেল, "তুমি গোল দিতে হয়তো পারো, কিন্তু

গোল খাওয়া বন্ধ করতে পারবে না। ফুটবল এগারোজনের খেলা মনে রেখো।”

আমার খুপরিতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে আমি বসেছিলাম। ঘরে কে এসে দাঁড়াল। মুখ তুলে দেখি নীলিমা একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে। সাগ্রহে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “বাবা কিছু বললেন কি তারপর ?”

“না, শুধু অনেকক্ষণ পর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল মুছে নিতে দেখেছি।”

“আমি ঠিক করিনি নীলিমা ?”

নীলিমা ভারী স্নিগ্ধ নরম স্বরে বলল, “তুমি আজ সব্বাইকে এতবড় উপহার দিলে প্রসূন! ওহ্ এত বিরাট। প্রসূন, কাল তুমি দারুণ খেলবে, ঠিক জিতবে।”

॥ ১৯ ॥

ফুটবল যে এগারোজনের খেলা, এই সত্য নির্মমভাবে উপলব্ধি করলাম পরদিন। আর একটি শিক্ষা পেলাম—জিতবোই এমন কথা কদাচ বলবে না। যাত্রীর কাছে আমরা ২—৩ গোলে হেরে গেলাম। মাঠে যে এত ভীড় হবে কল্পনা করিনি। মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টারই বেশি। ওরা যাত্রীর হার চায়, তাই সোনালীকে মদত দিতে ওরা সবাই সোনালীর সাপোর্টার হয়ে গেছে। ওরা আশা করেছিল আমি একটা কিছু করব।

কিন্তু যাত্রী শোভাবাজার নয়। অত্যন্ত আঁট আর চমৎকার গুছোনো ডিফেন্স্। ওদের লেফট হাফ অমিয় আর রাইট স্টপার ব্যাক দুলাল গত বছর মারডেকা টুরনামেণ্ট খেলে এসেছে। গোলকীপার শ্যাম যেদিন খেলে, সেদিন একটি মাছিও গোলে

ঢুকতে পারে না। তবে সেই দিনটি যে কোন্ খেলায় আসবে, তা কেউ বলতে পারবে না, শ্যামও না।

রাইট-ইন বিষ্ণু মিশ্র এ বছর জুনিয়ার ইনডিয়া ক্যাম্পে ডাক পেয়েছে, বলের উপর ভাল কনট্রোল আছে, তবে নিমাইয়ের মতো নয়। কিন্তু অনেক বেশি পরিশ্রমী আর যেমন ওঠে তেমনি নেমেও আসতে পারে। বুদ্ধিটা একটু কম। লেফট আউট আব্রাহামের মতো দ্রুত উইঙ্গার কলকাতায় দ্বিতীয় নেই। পেনালটি বক্সের কোণ থেকে ডান পায়ে এমন শট নেয় যার শতকরা নব্বুইটা গোলে ঢুকবেই। লেফট-ইন শিবরমন ছোট্টখাট্ট, অত্যন্ত চতুর, বক্সের মধ্যে ছুঁকছুঁক করে বেড়ায়। কখন যে গোল ছিনিয়ে নিয়ে যাবে বোঝা কঠিন। বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু সেটা জানতে দেয় না।

আমরা মরীয়া হয়ে খেলব প্রতিজ্ঞা করে নেমেছিলাম। পনেরো মিনিট পর্যন্ত দু' পক্ষই সতর্ক হয়ে শুধু মাঝ মাঠে খেলেছি। তারপরই বিষ্ণু হঠাৎ বল নিয়ে এগোয় আমাদের গোলের দিকে। রাইট হাফ ওর পিছু নেয়। বিষ্ণু বাঁদিকের কর্ণার ফ্ল্যাগের দিকে সরে গেল, আব্রাহাম ভিতরে ঢুকে এল। বিষ্ণু ব্যাক পাস দিল অমিয়কে, সে দিল আব্রাহামকে। কুড়ি গজ থেকে গোলে দুর্বল নীচু শট করল আব্রাহাম। সোনালীর গোলকীপার রবি ঝাঁপিয়ে ধরতে পারল না। আমার মনে হল, রবি যেন ইচ্ছে করেই দেরিতে ঝাঁপিয়েছে। হঠাৎ সেই কটা চোখের কথাটা মনে চমকে উঠল, "গোল দিতে হয়তো পার কিন্তু গোল খাওয়া বন্ধ করতে পারবে না।"

আমি শিউরে উঠলাম। তাহলে একশো টাকার নোটের কাছে নিজেকে বিক্রি করার লোক সোনালীতে ওরা পেয়েছে। কিন্তু ক'জনকে কিনেছে জানি না। প্রত্যেকের উপর আমার সন্দেহ হচ্ছে এখন। রাইট আউট একটা সহজ বল ট্রাপ করতে গিয়ে বাইরে পাঠাল, অমনি সন্দেহ হল। পারলে নিশ্চয় আমাকেই

দিতে হতো, কেননা চমৎকার জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে। আব্রাহাম রাইট ব্যাককে কাটাতে গিয়ে পারল না। রাইট ব্যাক বলটা পায়ে রেখে লোক খুঁজতে তাকাচ্ছে, আব্রাহাম বল ছিনিয়ে নিল আর আমার সন্দেহ হল। সোনালীর গলদ দেখছি আর সন্দেহ হচ্ছে।

হাফ টাইমের দু' মিনিট আগে যাত্রী দ্বিতীয় গোল দিল। ডানদিক থেকে চমৎকার মুভ করে বাঁ দিক থেকে শেষ করল আব্রাহাম। পোস্ট আর ক্রশবারের কোণ দিয়ে বিদ্যুৎবেগে বলটা ঢুকল। রবির কিছুই করার ছিল না। হাফ টাইমে দাস্থদাকে বললাম আমার সন্দেহের কথা, আর গতকাল যা ঘটেছে। দাস্থদা রবির কাছে গিয়ে কথা বলতে লাগলেন। দূর থেকে দেখলাম রবি খুব অবাক হয়ে গেল, হাত নেড়ে তর্ক শুরু করতেই দাস্থদা ইশারায় রিজার্ভ গোলকীপার অজিতকে ওয়ারম্-আপ করতে বললেন। রবির মুখ ফ্যাকাশে হতে দেখলাম।

খেলা আবার শুরু হতেই আধ মিনিটের মধ্যে আমি গোল দিলাম। সেণ্টার লাইন থেকে বল নিয়ে তিনজনকে কাটিয়ে ষোল গজ থেকে শট নিলাম। শ্যাম ঠাওর করতে পারেনি, অন্তত তিন গজ বাইরে দিয়ে যাওয়ার কথা যে বলের, সেটা বেঁকে এসে ঢুকতে পারে। বিরাট গর্জন উঠল ইস্টবেঙ্গল মাঠ কাঁপিয়ে। আমি এই প্রথম গোল দেওয়ার পর এতবড় আওয়াজ পেলাম। তিন মিনিট পর রাইট আউট তরতরিয়ে উঠে ক্রশ করল। শ্যাম গোল ছেড়ে বেরোতে সেকেণ্ড তিনেকমাত্র দেরি করে, বল মাটিতে পড়ামাত্র হাফ ভলিতে নেটে পাঠিয়ে দিলাম।

গ্যালারিতে যেন বাজ ডেকে উঠল আর মাঠ যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। চার-পাঁচজন আমাকে জাপটে ঘাড়ে পিঠে ওঠার চেষ্টা করছে। দম বন্ধ হয়ে মারা যাবার মতো অবস্থা। এরপর গ্যালারী থেকে শুধু "প্রসূনকে বল দে, প্রসূনকে, প্রসূনকে" রব উঠতে লাগল।

যাত্রী দ্বিগুণ উদ্যমে আক্রমণ শুরু করেছে। একে একে আমরা

পিছিয়ে নেমে ঠেকাবার চেষ্টা করছি। চাপ ক্রমশই বাড়ছে। নতুন অনভিজ্ঞ অজিত পাগলের মতো খেলছে। লক্ষ্য করলাম আমার কাছে যাত্রীর তুজন দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। ৬৫ মিনিট পর্যন্ত যাত্রীকে রুখে আর পারা গেল না। অমিয়র চীপ থেকে বিষ্ণু হেড করল, বারে লেগে বল ফিরে আসছে, রাইট স্টপার বলটা উড়িয়ে দিতে গিয়ে মিসকিক করে বিষ্ণুর পায়েই দিল। সেখান থেকে বিষ্ণু সহজেই গোল দিল।

হেরে গেলাম। মাঠ থেকে বেরোচ্ছি আর শুনছি "ওয়েল প্লেড প্রসূন।...সাবাস প্রসূন।" কিন্তু আমি মনে মনে কুঁকড়ে আছি। যাত্রীকে হারাবো বলে বাবার সামনে জাঁক করেছি। হারাতে পারলাম না। হঠাৎ পিঠে একটা মৃত্বু চাপড়ানি আর চাপা স্বরে 'তুমি সত্যিই ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে'—শুনে পিছনে তাকিয়ে সেই কটা চোখকে ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে যেতে দেখলাম।

টেণ্টে ফিরে রবিকে কয়েকটা কথা বলার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু বলতে পারলাম না। উন্মনা হয়ে ও এককোণে বসে রইল, কারুর সঙ্গে কথা বলল না। তারপর নিঃশব্দে এক সময় টেণ্ট থেকে বেরিয়ে গেল। পিন্টু আমার সঙ্গে রয়েছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি রওনা হলাম। বাসে পিন্টু বলল, "নিমাইদা আমার সামনে বসেছিল। তোমাকে একটা ছেলে গালাগাল দিতেই নিমাইদা তাকে এক চড় কষিয়ে দিয়েছে।"

"আনোয়ার ছিল?"

"হ্যাঁ।" নিমাইদাকে বার বার বলছিল, "তুই থাকলে প্রসূন আরো তু-তিনটে গোল পেত।"

"কী বলল নিমাই?"

"কিছু বলেনি।"

বাড়ি ফিরে অন্ধকার ঘরে শুয়ে রইলাম। খেলার রেজাল্ট পিন্টুই সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে। মা একবার ঘরে ঢুকে আবার বেরিয়ে গেলেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম না খেয়েই।

॥ ২০ ॥

যাত্রী লীগ চ্যামপিয়ন হল না। শীল্ডও শেষ হল না কোর্টের ইনজাংশানে। এর থেকেও আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটল পরের বছরের শুরুতেই। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, যুগের যাত্রী, তিনটি ক্লাবই আমাকে চেয়েছে। আমার ইচ্ছে মোহনবাগানে যাওয়ার। কিন্তু শুনলাম হাবিব আর সুকল্যাণকে ওরা নিচ্ছে, সুভাষকে ইস্টবেঙ্গল। আমি দোটানায় পড়েছি—যাব কি যাব না, গেলে খেলার সুযোগ পাব কি পাব না, এমন সময় যাত্রী আমায় ছ' হাজার টাকা দর দিল।

যাত্রীর সম্পাদক অনাদি বিশ্বাসের বাড়িতে কথা হচ্ছিল। আর ছিল সেই কটা চোখ। পরে ওর নামটা জেনেছি, ডাকুদা। যাত্রীর টিম সিলেকশন কমিটির মেম্বার। বছরে হাজার দশেক টাকা খরচ করে। ক্লাবের মধ্যে প্রতিপত্তিতে সম্পাদকেরও উপরে। ডাকুদাই নাকি বিশেষ করে আমাকে চেয়েছে।

"তুমি অনিল ভটচাজের ছেলে। তোমার উপর তো যাত্রীর বিশেষ দাবী আছে।" সম্পাদক এই বলে তাকাল ডাকুদার দিকে। ডাকুদা শুধু মাথা নাড়ল। "বাপ-ছেলে একই ক্লাবে খেলবে এটাই তো স্বাভাবিক। তাছাড়া—" সম্পাদক থেমে গেল। ডাকুদার দিকে একবার তাকিয়ে কেশে বলল, "তোমার বাবার উপর সুবিচার করেনি যাত্রী। আমি জানি, কিন্তু তখন আমি তো ক্লাবের একটা অরডিনারি মেম্বার। সেই ফাইনাল খেলা আমি দেখেছি। আহ্, কি খেলা তোমার বাবার, এখনো চোখে ভাসছে। অথচ ওর নামেই কিনা কলঙ্ক রটানো হল। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। আমাকেই করতে হবে।" সম্পাদকের যেন

আবেগে কণ্ঠরোধ হল। আমার মন দুলে উঠছে বাবার প্রশংসা শুনে। যাক্ তাহলে সবাই বিশ্বাস করে না।

"এবার আমরা ইয়ং টিম করব। বয়স হয়ে গেছে বেশির ভাগেরই। তোমাদের দিয়েই রিপ্লেস করাব। বাইরে থেকে আর প্লেয়ার আনব না। কেড়ে নাও, এই সব বুড়োদের হটিয়ে জায়গা কেড়ে নাও। ইনডিয়া টিমে যাত্রীর কোটা আছে, আমি তোমায় পুশ করব। স্কুল ফাইনালটা পাশ করো, আমি তোমায় ব্যাঙ্কের চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবো। যাত্রীর মেস আছে, সেখানে থাকবে। ভাল খাবে, ভাল করে খেলবে···এতো অল্প বয়স, কতো সম্ভাবনা তোমার সামনে।" সম্পাদক আন্তরিক স্বরে যেভাবে বলল, তাতে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম।

"ছ' হাজার টাকা এখন তোমায় কেউ দেবে না, কিন্তু আমরা দেবো।" ডাকুদা হাতের নখ পরীক্ষা করতে করতে বলল, "এটা কিন্তু ঘুষ নয়।"

আমি এবার একটু লজ্জা পেলাম। বললাম, "আমি সৎভাবে টাকা রোজগার করতে চাই।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, তাই তো উচিত।" সম্পাদক টেবল চাপড়ে বলে উঠল। ডাকুদা ঘড়ি দেখে বলল, "আচ্ছা প্রসূন, তাহলে এই কথাই রইল। তুমি ভেবে দেখ। এখনো মাসখানেক সময় তো আছে।"

ওখান থেকে আমি সোজা দাসুদার বাড়ি গেলাম। সব কথা শুনে দাসুদা বললেন, "তুই যাত্রীতেই যা। সোনালীতে থাক্, এমন কথা আমি বলব না। নিজের ভবিষ্যৎ তোকে দেখতে হবে তো। ফুটবলই তোর সব কিছু। তুই এবার বড় ক্লাবে যা। তবে সাবধানে থাকিস। ওখানে টাকা-পয়সা যেমন বেশি, দলাদলিটাও বেশি। ডাকু লোকটা সুবিধের নয়। অনেক ছেলের ক্ষতি করেছে, কেরিয়ার শেষ করে দিয়েছে।"

"আমার কি ক্ষতি করবে? আমি যদি খেলতে পারি, তাহলে

আমায় আটকাবে কে? খেলা দেখিয়েই এতটা এসেছি, আরো যাবো।" আস্থাভরেই কথাগুলো বললাম। দাস্থদা হেসে বললেন, "তাই যেন পারিস।"

আমি যাত্রীতেই সই করলাম। ডাকুদা সেই দিনই তু' হাজার টাকা দিল। বাকিটা সারা বছরে চার কিস্তিতে দেবে। আমি সই করার তু'দিন পরেই কাগজে দেখি, আনোয়ার আর নিমাই যাত্রীতে সই করেছে। মনে মনে আমি ভীষণ খুশী হলাম।

দাস্থদাকে বলেছিলাম, যদি খেলতে পারি, তাহলে আমায় আটকাবে কে? কিন্তু খেলার সুযোগই যদি না পাই, তাহলে পারি কি পারি না, প্রমাণ করব কেমন করে! যাত্রীর প্রথম পাঁচটা ম্যাচ ড্রেস করে সাইড লাইনের ধারে বেঞ্চে বসে থাকলাম। আমাকে খেলানো হচ্ছে না, আমি নাকি খুবই কাঁচা, অনভিজ্ঞ। বালী প্রতিভা কি কালীঘাটের সঙ্গে খেলার মতন যোগ্যতাও নাকি আমার নেই। এইসব টিমের সঙ্গে খেলাতেও যাত্রীর কমিটি মেম্বারদের মুখ শুকিয়ে আসে, নতুন ছেলেদের নামাতে ভয় পায়। যদি পয়েণ্ট যায়, তাহলে দোষ পড়বে কমিটির ঘাড়ে। তার থেকে নামী বুড়ো প্লেয়াররা নিরাপদ, কিছু ঘটলে দায়িত্বটা ওদের।

আনোয়ারকে প্রথম তুটো ম্যাচ খেলানো হয়নি। বালীর সঙ্গে ভালো খেলল, তারপর আর বসেনি। নিমাইও ওই ম্যাচে আধখানা খেলেছে। পরের ম্যাচ খিদিরপুরের সঙ্গেও আধখানা। কালীঘাটের সঙ্গে খেলার দশ মিনিটেই শিবরমনের চোট লাগা হাঁটুতে আবার লাগতে নিমাই নামে। তুটো গোলও দেয়। নিমাইকে এখন আর বসানো যাবে না।

যাত্রীর কোচ প্রিয়দাকে একদিন অধৈর্য হয়ে বললাম, "আমাকে কি বসিয়ে রাখার জন্য এনেছেন?"

"কী করব ভাই," নির্বিরোধী প্রিয়দা এধার ওধার তাকিয়ে চাপা স্বরে বললেন, "টিম করে সিলেকশন কমিটি, আর কমিটি মানে ডাকুদা। আমার কোন কথাই কানে নেয় না। তুমি বরং ওকেই

একদৃষ্টে জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ল, দু'হাজার টাকা নিয়ে বাড়িতে পৌঁছনো মাত্র কেমন উৎসবের মতন হৈচৈ শুরু হয়ে গেছল। বিশু দত্তও নেমে এল উপর থেকে। পিণ্টু, পুতুল, নীলিমা ভীড় করে দাঁড়ালো। বাবা বাড়ি ছিলেন না।

"আরে বাব্বাঃ, ফুটবল খেলে অ্যাতো টাকা পাওয়া যায়, তাহলে তো ছোটবেলায় বল পেটালেই লাভ হতো দেখছি!" বিশু দত্ত বলল।

"সবার কি আর সব জিনিস হয় দত্ত মশাই, এসব হল গিয়ে ভগবানদত্ত ব্যাপার। প্রসূনকে তো একটা রিসেপশন দেবার ব্যবস্থা করা উচিত।" নুটুদা চট করে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

"তার আগে একটু খাওয়া-দাওয়া হোক। কী প্রসূন, পরোটা আর মাংস হবে নাকি?"

মা তখুনি টাকা দিলেন। বিশু দত্তই বাজারে গেল। সারা বাড়ির নেমন্তন্ন। নীলিমাকে বললাম, "এবার আমার সব ধার শোধ করব। এখন আমিও কলেজে ভর্তি হয়েছি—ফুটবলের কলেজে।"

বাবা অনেক রাত্রে ফেরেন। আমি জেগে শুয়ে ছিলাম। মা নিশ্চয় বাবাকে বলবেন। উত্তরে বাবা কী বলবেন? দারুণ খুশী হবেন, না যথারীতি মুখ ফিরিয়ে চুপ করে থাকবেন! এক সময় বাবা ফিরলেন। ও ঘরে মা'র কথা বলার শব্দ পেলাম। তারপর আলো নিভে গেল। সকালে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম—বাবাকে বলেছো? মা বললেন, "উনি খুব অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, আমি সাত বছর খেলেও এত টাকা পাইনি।"

জিগ্যেস করো।"

ডাকুদাকে সেই দিনই ধরলাম। ওর কয়েকজন পেটোয়া প্লেয়ার আছে, তার মধ্যে দুজন বিষ্ণু আর আব্রাহাম তখন ডাকুদার সঙ্গে ক্লাব টেণ্টের বাইরে বাগানে চেয়ারে বসে গল্প করছিল। আমি সটান জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাকুদা, আমাকে নিয়ে এলেন, কিন্তু খেলাচ্ছেন না কেন ?"

"দরকার হলেই খেলাব।" ডাকুদা হাতের নখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন।

"কবে দরকার হবে ?"

"বলতে পারছি না এখন। হয়তো এই সিজন-এ দরকার নাও হতে পারে।"

"তাহলে এত টাকা খরচ করছেন কেন আমার জন্য ? বসে থেকে থেকে যে আমার খেলা নষ্ট হয়ে যাবে।" কাতর স্বরে আমি বললাম।

"যাত্রীর মতন ক্লাব তোমার মতন দু-চারটে প্লেয়ারকে বসিয়ে টাকা দিলে দেউলে হয়ে যাবে না। টাকার জন্যই তো খেলা, তা যখন পাচ্ছ তখন এত উতলা হওয়া কেন ?" ডাকুদা তার কটা চোখ দুটো বিরক্তিতে সরিয়ে নিলেন আমার মুখের উপর থেকে।

বিষ্ণু ব্যস্ত হয়ে বলল, "এখন যা তো, আমরা দরকারী কথা বলছি, পরে যা বলার বলিস।"

মুখ কালো করে আমি চলে এলাম। নিমাই হেসে হেসে দুটো ছেলের সঙ্গে টেণ্টের মধ্যে কথা বলছে। দেখেই বোঝা যায় পয়সাওলাঘরের ছেলে। প্রায়ই ওদের দেখি, নিমাইকে নিয়ে সন্ধ্যার পর বেরিয়ে যেতে। নিমাই আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে আবার গল্প করতে লাগল। আনোয়ার আজ আসেনি। আমি ক্লাব থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালাম।

॥ ২১ ॥

আনোয়ার আর নিমাইয়ের সঙ্গে যাত্রীতে এসে প্রথম দেখা প্র্যাকটিস শুরুর আগের দিন। ড্রেসিং রুমে আমরা জনাকুড়ি, কারুর সঙ্গেই তেমন আলাপ নেই। ওদের দুজনের পাশে আমি বসেছিলাম আড়ষ্ট হয়ে। প্রিয়দা আমাদের কাছে ফুটবল সম্পর্কে ছোটখাট একটা বক্তৃতা দেন। ওর পাশে বসেছিল ডাকুদা। যুগের যাত্রীর ঐতিহ্য এবং তা বহন করার দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে ডাকুদাও দু-চার কথা বলে।

"ফুটবল খুবই সহজ খেলা যদি না তুমি একে জটিল করে খেলো।" প্রিয়দা প্রথমেই এই কথাটা বলেছিলেন, "আমরা এত বড়ো, এত পুরনো টিম, কিন্তু আজ পর্যন্ত কখনো লীগ বা শীল্ড পাইনি। একবার মাত্র ফাইনালে উঠেছিলাম, কিন্তু—" ডাকুদা থেমে গিয়ে আমার দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সকলের চোখ আমার উপর এসে পড়েছিল।

আমি প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, যেন তারা অদ্ভুত একটা জন্তু দেখছে। কারুর ঠোঁট বাঁকা, কেউ কেউ চোখে চোখে হাসল। আমি মাথা নিচু করে ঘেমে উঠলাম। মনে হল, ডাকুদা ইচ্ছে করে আমাকে এই অবস্থায় ফেলেছে। যেন কিছু একটার প্রতিশোধ নিচ্ছে। নিমাই তখন হঠাৎ বলেছিল, "ফাইনালে উঠে কেউ না কেউ তো হারবেই। আমরা আবার যাত্রীকে ফাইনালে তুলব, শীল্ডও নেব।" বলে নিমাই সকলের মুখের দিকে তাকায়। শুধু আনোয়ার বলে, "নিশ্চয়।"

বেলেঘাটায় যাত্রীর মেসে আর চারজনের সঙ্গে নিমাইও থাকে। আনোয়ার আর আমিও ছিলাম লীগ শুরুর আগে পর্যন্ত। সকালের

প্র্যাকটিস বন্ধ হওয়ায় আর একটার পর একটা খেলায় বসে থাকায় বিরক্ত ও হতাশ হয়ে আমি বাড়ি চলে আসি। মেসে কারুর সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলতাম না।

নিমাই আর আনোয়ারকে বিশেষ করে এড়িয়ে চলতাম। দেখা হলে কথা হতো। সাধারণ কথা। আগের মতন গলাগলি আর ফিরে আসেনি। কিন্তু বুঝতে পারি, ওরা চায় আবার আমরা 'থ্রি মাসকেটিয়ারস্' হই। কিন্তু আমিই সহজ হতে পারি না। সকলের সামনে ডাকুদা শীল্ড ফাইনালের কথা তোলার পর থেকে আমি কুঁকড়ে গেছি।

বাড়িতে কেউ খেলা নিয়ে কথা বলত না। খেলার দিন দুপুরে যখন বাড়ি থেকে বেরোই, তখন শুধু পিণ্টুর কথা মনে পড়ত। কিন্তু ও স্কুলে থাকে দুপুরে। বাড়িতে থাকলেও মাঠে যাবার বায়না ধরবে না। ও বোঝে আমার অবস্থাটা। নীলিমা আর মা, ওরাও কিছু বলে না। দিনরাত পড়াশুনা করে ফেল করলে, বাড়ির লোক যেমন ব্যবহার করে, ওরা তাই করছে। শুধু বিশু দত্ত একদিন দোতলা থেকে চেঁচিয়ে বলেছিল, "কী গো প্রসূন, কাগজে আর নামটাম দেখছি না যে?"

কখন যে চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়তে শুরু করেছে বুঝিনি। বুকের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস জমে উঠেছিল। ধীরে ধীরে সেটা গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়ায় মিশিয়ে দিলাম। কানে কানে কে যেন বলল, 'হাল ছেড়ো না, হতাশ হয়ো না, প্রসূন! উদ্যত থাকো, সময় এলেই আঘাত করবে।' আমি আপন মনে মাথা নাড়লাম। পারব না, আর আমি পারব না। ইডেনের ধারে বাস-স্ট্যাণ্ড। আমি শেষ বাসে উঠে বাড়ি এলাম।

হাওড়া ইউনিয়নের সঙ্গে ৫—০ গোলে যাত্রী জিতছে, খেলা শেষ হতে প্রায় দশ মিনিট বাকী। ডাকুদা ইশারায় প্রিয়দাকে

ডাকল। তারপর প্রিয়দা আমার কাছে এসে বললেন, "ওয়ারম্ আপ্ প্রসূন।"

অবাক হয়ে গেলাম। তাহলে কি কপাল ফিরল! প্রিয়দা রাইট আউট সলিল করকে ডেকে নিলেন। নামার আগে মাঠে আঙুল ঠেকিয়ে যখন কপালে-বুকে ছোঁয়ালাম, সারা শরীর কেঁপে গেল। নিমাই ছুটে কাছে এসে বলল, "বল দেবো, গোল কর্।"

আধ মিনিটের মধ্যেই নিমাই বল পাঠাল, হাওড়ার হাফ লাইন বরাবর। ছুটে গিয়ে ধরতে পারলাম না। গ্যালারিতে আওয়াজ উঠল। চারদিকে তাকিয়ে কেমন অস্বস্তি হল। নতুন-নতুন লাগছে সব। প্লেয়াররা কতদূরে ঠিক আন্দাজ হচ্ছে না। কখন ছুটব, ফাঁকা জমি কোথায়, বল কোথা থেকে আসবে কিছু বুঝছি না।

দিনরাত পড়ে জলের মতন যা মুখস্থ ছিল, এখন আর তা মনে পড়ছে না। অনেক দিন বই না খুললে যা হয়। উৎকণ্ঠায় ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। ক' মিনিট পরেই হুইশল বাজবে। তার মধ্যে একটা কিছু করতেই হবে। ডজ করব কি তিন-চারজনকে? চেঁচালাম, "নিমাই, দে।"

গ্যালারিতে হাসির রোল উঠল। একজনকে কাটিয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। বলকে সেই রকম আগের মতন অনুভব করতে পারছি না। বলটা পায়ে আছে কি নেই, বুঝতে পারিনি। শরীরটাকে কতখানি দোলাব, কোমর থেকে ঝাঁকুনিটা কখন দেবো, আন্দাজ করতে পারিনি।

নিমাই বল নিয়ে ডানদিকের কর্ণার ফ্ল্যাগের দিকে এগোচ্ছে। আমি ভিতরে ঢুকে এলাম বক্সের মধ্যে। নিমাই কাটাল লেফট ব্যাককে। বলটা আমায় ঠেলেই স্টপারকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বলল, "বল দে আমায়।" আমি বল ঠেললাম সোজা স্টপারের পায়ে। গ্যালারি বিরক্তি জানাল বেশ জোরেই। নিমাই করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঘাবড়ে গেছিস।

বী স্টেডি।”

পাঁচ গোলে জিতছি তাই আমার বোকামি আর অপদার্থতা রাগের বদলে মজার জিনিস হয়ে উঠল গ্যালারিতে। খেলার মধ্যে আর কিছু উত্তেজনা নেই, তাই ওরা নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। একটার পর একটা ভুল করছি আর মনে হচ্ছে যেন ডুবে যাচ্ছি। বিষ্ণু কোমরে হাত দিয়ে হাসছে। অমিয় মজা পেয়ে বলছে, “অ্যাই, অ্যাই, প্রসূনকে বল দে।” গ্যালারি ফেটে পড়ছে হাসিতে। নিমাইয়ের ডিফেন্স্ চিরে দেওয়া থ্রুটা যখন প্রচণ্ডভাবে পোস্টের চার গজ বাইরে মারলাম, তখন হাওড়ার দু-তিনজনও হাসি চাপতে পারল না। আমি হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে পড়লাম। আর তখনই খেলা ভাঙার হুইশল বাজল। কে এসে আমার পিঠে হাত রাখল। মুখ তুললাম। দেখি নিমাই চলে যাচ্ছে।

আমি যাত্রীর টেন্টের দিকে লীগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর যাইনি। ক্লাব থেকে লোক এসেছিল ডাকতে। শিবরমনের হাঁটুতে জল জমেছে। এই সিজনে আর খেলতে পারবে না। নিমাই আর বিষ্ণুর উপর চাপ পড়ছে খুব। একটা ম্যাচও জিরোতে পায়নি ওরা। মাঝে মাঝে দীপুদাকে খেলানো হয়েছে ওদের একজনকে বসিয়ে। দীপুদা তেরো বছর আগে যাত্রীতে প্রথম খেলা শুরু করেন। এখন আর পারেন না। নতুন ছেলেদের মধ্যে সৌমেন আর বলাইয়ের নাম কাগজে দেখেছি।

যাত্রী লীগে চতুর্থ হয়েছে। বছরের সব থেকে বড় কৃতিত্ব মোহনবাগানের কাছ থেকে একটা পয়েন্ট নেওয়া। নিমাই প্রথমে গোল দিয়েছিল। পেনালটি থেকে প্রণব গাঙ্গুলী শোধ করে। কাগজ পড়ে বুঝতে পারলাম না নিমাই কেমন খেলেছে। রিপোর্টারদের মধ্যে যাত্রীর সাপোর্টার একজনও নেই। মোহনবাগানকে গোল দিতে পেরে নিমাই যে দারুণ খুশী তাতে আমার সন্দেহ নেই।

বিকেলে আমার ছোট্ট পাঠশালায় পিণ্টুর বন্ধুদের নিয়ে

প্র্যাকটিস করছিলাম। তখন নিমাই আর আনোয়ার এসে হাজির। আমি অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলাম শুধু। ওরা রঙচঙে বুশ শার্ট পরেছে, চুলগুলো যেমন বড়, জুলফিও তাই। পায়ে দামী চটি। দুজনেরই হাতে বিদেশী ঘড়ি।

"যাস না কেন টেন্টে?" নিমাই বলল।

আমি ফিকে হাসলাম। "কেন যাই না সেটা তো বুঝতেই পারিস।"

"ফুটবল খেলায় ওরকম অনেক কিছু হয়। মাঠে আয়, প্র্যাকটিস কর, আবার খেলা ফিরে পাবি। এই ছোট মাঠে বল নিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে ঠুকঠুক করে আরো খেলা খারাপ করছিস কেন?" আনোয়ার বলল।

তর্ক করতে পারতাম, ইচ্ছে হল না। বললাম, "যাব'খন। প্র্যাকটিস হচ্ছে নাকি?"

"হবে না? শীল্ডের খেলা তো এসে গেল। এবার ইনডিয়ার বাইরের টিম খেলতে আসছে। তুই আয়, তোকে দরকার। ফরোয়ার্ডে আর কেউ তো নেই। বিষ্ণু ইনজুরি নিয়ে খেলেছে লীগের শেষ ক'টা ম্যাচ। আবার লেগে গেলে একদম বসে যাবে।" নিমাই ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল।

"আমায় খেলাবে ভেবেছিস ডাকুদা?"

"আয় না, তারপর দেখা যাবে। গড়ের মাঠ থেকে দূরে থাকিস না, ওতে ক্ষতিই হবে। সকালে আসিস, কেমন?"

মনটা চনমন করে উঠল। গড়ের মাঠ, শীল্ড, ফুটবল এই শব্দগুলোয় শিহরণ লাগে। শীল্ডে খেলার লুকোনো ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীর গ্যালারির বিদ্রূপের হাসিও কানে বেজে উঠল। আমি বলে ফেললাম, "কেমন যেন ভয় করছে।"

ওরা অবাক হয়ে গেল। আনোয়ার বলল, "কীসের ভয়? পাবলিককে? গোল দে, দেখবি, আবার ওরাই তোকে মাথায়

তুলে নাচবে।”

নিমাই বলল, “গোল তুই পাবিই, আমি তো আছি।” ঘড়ি দেখে বলল, “রাজুরা অপেক্ষা করছে রে, আনোয়ার! আর নয়, দেরি হয়ে গেছে। তাহলে কাল, কেমন ?”

ওরা চলে যাবার পর মনে হল, আগের দিন হলে এমন করে আমায় ফেলে নিমাই কি আনোয়ার চলে যেত না, এমন পোশাকী ঢঙে কথা তো বলতোই না। আমি অনেকক্ষণ ভাবলাম ওদের কথা। ঠিকই বলেছে, এই ছোট জমিতে ছোটদের সঙ্গে খেলে কিছুই হবে না। গড়ের মাঠের বিরাট জমি, হাজার হাজার লোক, সেই আবহাওয়া আর উত্তেজনার কাছাকাছি থাকতে হবে। দেহে মনে শুষে নিতে হবে। ঠিক করলাম, আবার যাত্রীর মাঠে যাব প্র্যাকটিসে।

॥ ২২ ॥

আমার যে কত বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয় আছে, সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝলাম যাত্রী শীল্ড ফাইনালে উঠতেই। টিকিট, টিকিট, একখানা টিকিট। ‘প্রসূন, তোকে সেই কত ছোট্টটি দেখেছি, আর কি বড়ই না হয়ে গেছিস···প্রসূন, মনে আছে কি বলেছিলি···প্রসূনদা আমি কিন্তু ছাড়ব না, আপনার দরজায় হাঙ্গার স্ট্রাইক হবে, মাঠে যেতে দোব না···’ ঝালাপালা হয়ে গেলাম আমি। হেসে মাথা নেড়ে, আচ্ছা দেখব, চেষ্টা করব, এইসব বলে পাশ কাটাচ্ছি। যুগের যাত্রী কুড়ি বছর পর আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে! সেমি-ফাইনালে মহামেডানকে এক গোলে হারিয়েছে। গোলটা দিয়েছে অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি—প্রসূন ভট্টাচার্য।

দ্বিতীয় রাউণ্ডে যাত্রীর প্রথম খেলায় আমি আর বিষ্ণু আধাআধি খেলি কটক কম্বাইণ্ডের বিরুদ্ধে। বিষ্ণু খোঁড়াচ্ছিল।

ওকে তুলে নিয়ে প্রিয়দা আমাকে নামান। ৩—০ জিতি, তার মধ্যে একটা গোল আমার। অমিয়র লম্বা থ্রো নিমাই হেড করে আমার পায়ে ফেলামাত্র হাফ ভলিতে মারি ১২ গজ থেকে। গোলকীপার নড়ার সময় পায়নি। তৃতীয় রাউণ্ডে গোয়ার ভাসকো ক্লাবকে ২—০ হারালাম। আমি গোল করতে পারিনি, সলিল আর আব্রাহাম গোল দেয়। ওদিক থেকে রেঙ্গুন ইউনাইটেড উঠেছে কোয়ার্টার ফাইনালে। জলন্ধর লীডারসকে ২—১ গোলে হারিয়ে উঠল সেমি ফাইনালে। এই প্রথম ইডেনে বসে আমি ফুটবল খেলা দেখলাম। রেঙ্গুনের সেণ্টার ফরোয়ার্ডের আর রাইট হাফের খেলা আমার ভাল লাগল। আর কারুর নাম মনে রাখতে পারিনি, শুধু মংবা আর লী সান ছাড়া। মংবা-র বেশ বয়স হয়েছে, অন্তত পঁয়ত্রিশ তো বটেই। প্রথম গোল খেয়েই রেঙ্গুন চঞ্চল হয়ে ওঠে, খেলায় সাময়িক বিশৃঙ্খলা আসে। মংবা বল ধরে শান্ত ধীরভাবে প্লেয়ারকে কাটিয়ে দেখেশুনে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। খেলার গতি ধীর করে আবার টিমকে গুছিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত মংবা তার চমৎকার বল কনট্রোল ক্ষমতাকে যেভাবে লাগাচ্ছিল, তাতে শ্রদ্ধা হল ওর উপর। লী সান-ও বয়স্ক, নিজেদের পেনালটি বক্স পর্যন্ত নেমে এসে বল নিয়ে আবার উঠছিল। চট্ করে একজনকে বলটা ঠেলে দিয়েই লী সান আচমকা বুলেটের মতো এগিয়ে আবার পাশটা নেয়। একসঙ্গে তুজন কেটে যায় সেই দৌড়ে। তু' পায়ে তৈরী কিক্, হেড দিতে ওঠে সবাইকে ছাড়িয়ে। শুনলাম বর্মা টিম থেকে তুজনেই এবার বাদ পড়েছে।

আমরা এরিয়ান আর শিখ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারকে হারিয়ে উঠলাম সেমি-ফাইনালে। আমি গোল করতে পারিনি তুটো খেলাতেই। মহামেডান তু'দিন ড্র করে ইস্টবেঙ্গলকে এক গোলে হারিয়ে আমাদের সামনে পড়ল, ওদিকে উঠল মোহনবাগান-রেঙ্গুন ইউনাইটেড।

সেমি-ফাইনাল খেলার আগের দিন ক্লাব প্রেসিডেণ্টের পার্ক

সারকাসের বাড়িতে আমাদের রাখা হল। তিনতলায় বিরাট একটা হলঘরে আমরা রইলাম। আব্রাহাম, শ্যাম, অমিয়-রা অনেক রাত পর্যন্ত তাস খেলল। সকালে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে হল শোভাবাজারের টিকাদারের মতো যেন একজনকে ঢুকতে দেখলাম গেট দিয়ে। একটু পরে প্রিয়দা থমথমে মুখে দুজন সিনিয়ার প্লেয়ারকে ডেকে নিয়ে গেলেন।

দুপুরে খাওয়ার পর শ্যাম আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "একটা বিশ্রি খবর এসেছে প্রসূন, আনোয়ার নাকি টাকা খেয়েছে।"

'থ' হয়ে গেলাম আমি। অকল্পনীয় এবং ডাহা মিথ্যে। আমি বললাম, "বিশ্বাস করি না।"

"সত্যি-মিথ্যের কথা নয়! খেলার ঠিক আগে কারুর সম্পর্কে এ ধরনের কথা রটলে তাকে বসাতে হয়। মুশকিল হয়েছে ম্যাচটা মহামেডানের সঙ্গে আর আনোয়ারও মুসলমান। চট্ করে সবাই বিশ্বাস করে নেবে।"

"খবরটা কে দিল?"

"সকালে দু'বার উড়ো টেলিফোন এসেছে, তাছাড়া টিকাদার এসেও বলে গেল আনোয়ারকে নাকি পরশু রাতে গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে বেরোতে দেখেছে, সঙ্গে ছিল মহামেডানের দুজন অফিসিয়াল।"

"বাজে কথা," আমি চিৎকার করে উঠলাম। "আনোয়ার আর আমি পরশু একসঙ্গে টেন্ট থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি গেছি। এসব টিকাদারের বদমাইসি, ও শোধ নেবার জন্য রটাচ্ছে।"

আমি ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি, ডাকুদা আর প্রিয়দা গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে। বাকি সবাই বিস্মিত, অপ্রতিভ চোখে কেউ কেউ নির্বাক, কেউ চাপা স্বরে দু'একটা কথা বলছে। ঘরের এককোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে আনোয়ার বসে।

"আনোয়ারের আজ না খেলাই উচিত।" ডাকুদা বলল, "মনে অস্বস্তি নিয়ে খেলা যায় না।"

"নিশ্চয় খেলবে।"

আমার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, সবাই চমকে উঠল। "বাজে মিথ্যা গুজবের কাছে মাথা নোয়াব কেন?"

"যদি আজ যাত্রী হারে, যদি আনোয়ারের গলদেই গোল হয়, তাহলে আমাদের আর আনোয়ারের অবস্থাটা কি হবে বুঝতে পাচ্ছ?" ডাকুদা বলল। এত উদ্বিগ্ন হতে কখনো ওকে দেখিনি।

"না, যাত্রী হারবে না। আজ আমরা জিতবই।"

আমি তাকালাম নিমাইয়ের দিকে। নিমাই চুপ করে শুনছিল এতক্ষণ। বলল, "আনোয়ার যদি খেলে যাত্রী হারবে না।"

গলা খাঁকারি দিয়ে শ্যাম বলল, "আনোয়ার আজ খেলবে। নয়তো আমার বদলে অন্য কেউ গোলে খেলুক।"

আব্রাহাম বলল, "আনোয়ারকো খেলানেই হোগা।"

গড়িয়ে পড়ার একটা শব্দ শুনে আমরা তাকিয়ে দেখি, ঠেস দিয়ে বসা আনোয়ার জ্ঞান হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

আনোয়ার বিকেলে খেলেছিল। গোলটা আমি দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু একজনে একটা টিমের সঙ্গে কিভাবে লড়তে পারে, সে ধারণাটা সেদিনই প্রথম হল। খেলার পর আমরা আনোয়ারকে কাঁধে করে মাঠ থেকে বেরোই। শ্যাম দু'বার মাত্র বল ধরে সারা ম্যাচে। আনোয়ারকে চারবার আমি মহামেডান পেনালটি বক্সের মধ্যে দেখেছি, গোল করতে উঠে এসেছিল।

পরদিন মোহনবাগান হেরে গেল রেঙ্গুন ইউনাইটেডের কাছে ০—২ গোলে।

॥ ২৩ ॥

রাত্রে ঘুম আসছে না। শীল্ড ফাইনালের আর ৪০ ঘণ্টাও বাকি নেই। কাল সকালে আমরা প্রেসিডেন্টের বাড়িতে জমা হব। সেখান থেকে ফাইনাল খেলতে ইডেনে যাব। ছটফট করছি বিছানায়। অস্বস্তি আর উত্তেজনা, ভয় আর আশা সব মিলিয়ে আমার সারা শরীর দপদপ করছে, মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। এমন সময় কে ঘরে ঢুকল। অন্ধকারে তাকিয়ে বুঝলাম, মা।

পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা বললেন, "ঘুম আসছে না!"

প্রশ্ন নয়, মা যেন খবরটা জানিয়ে দিলেন। আমি 'উঁ' বলে মা'র কোলে মাথা তুলে দিলাম।

"জানি। এই রকমই হয়। ফাইনাল খেলা কি জিনিস আমার জানা আছে।"

"বাবা কিছু বলেননি! আমি যাত্রীর হয়ে ফাইনাল খেলব, বাবা কিছু বলেননি?"

"ও ঘরে, তোর মতোই ছটফট করছে।"

মা আমার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। ধীরে ধীরে ঘুম নেমে আসছে চোখে। স্নিগ্ধ হয়ে জুড়িয়ে আসছে শরীর। মা'র শরীর থেকে দূর্বা ঘাস আর ভিজে মাটির গন্ধে ম ম করে উঠছে ঘরটা। মনে হচ্ছে বল নিয়ে আমি খেলা করছি। ঘুম জড়িয়ে আসছে সর্বাঙ্গে। তন্দ্রাচ্ছন্ন গলায় বললাম, "কাল টিকিট পাঠিয়ে দেবো, তুমি খেলা দেখতে যেও!"

তারপর আমি শাদা-কালো ফুটকি দেওয়া বলটা নিয়ে হেলে-দুলে এগোতে লাগলাম, লাফালাম, হঠাৎ ছুটলাম। পড়ে গিয়ে

আবার উঠলাম। মা'র বুকের মধ্যে বড় বড় ঢেউয়ের ওঠাপড়ার শব্দ হচ্ছে। প্রবল বেগে বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার জল যেন ছুটে আসছে।

"পরশু তোর বাবাও খেলবে খোকা। তোর মধ্য দিয়ে ফিরিয়ে আনবে যা হারিয়েছে। তুই জিতবি, ঠিক জিতবি।"

ক্রমশ মা'র গলার স্বর দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে আর এগিয়ে আসছে প্রচণ্ড গর্জন। আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আমি কোথায় যাব, কোথায় আশ্রয় নেব? সাহায্যের জন্য চীৎকার করে উঠলাম—স্ট্রাইকার, স্ট্রাইকার।

গর্জনটা আরো জোরে আমাকে গোল হয়ে ঘিরে ধরল।

এত লোক! ষাট-সত্তর হাজারের কম নয়। একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল আমার শট রেঙ্গুনের বার ছুঁয়ে বেরিয়ে যেতেই। ৩৫ গজ থেকে শটটা নিয়েছিলাম, আচমকা।

বাইরে থেকে প্রিয়দা পাগলের মতন হাত নাড়ছেন আমাকে পিছিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতে দিতে। আজ সকালে বারবার আমাকে বলেছেন, দশ নম্বরের সঙ্গে ছায়ার মতো থাকবে গোপাল। তুই নেমে এসে গোপালের জায়গাটা সামলাবি। লী সান-টাই হচ্ছে ডেনজারাস্। ওকে আটকালে ওদের অ্যাটাক খোঁড়া হয়ে যাবে।

গোপালকে নিয়ে লী সান একবার ডাইনে আর একবার বাঁয়ে যাচ্ছে। বড় বড় গ্যাপ পড়ছে আমাদের ডিফেন্সে। আমি নেমে এসে কোন্‌দিক যে সামলাব ভেবে পাচ্ছি না। ওদের অ্যাটাক খোঁড়া করতে গিয়ে যাত্রীর অ্যাটাকই খোঁড়া হয়ে গেছে তবু মাঝে মাঝে এগিয়েছি আর প্রিয়দা হাত নেড়ে আমাকে পিছিয়ে যেতে বলেছেন। এক সময় নিমাইকে বললাম, "এভাবে চললে আমরা গোল খাব। ওদের বক্সে বল নিয়ে গিয়ে খেলতে

হবে। আমাদের ডিফেন্‌স্‌ থেকে প্রেশার তুলতে হবে, নয়তো এই প্রেশার রাখতে পারব না।"

বলতে বলতেই আমরা গোল খেলাম। কর্ণার ফ্ল্যাগের কাছ থেকে রেঙ্গুনের লেফট আউট সেণ্টার করে। লী সানকে নিয়ে গোপাল ব্যস্ত। লেফট ব্যাক উঠে এসেছিল। চলতি অবস্থাতেই কুড়ি গজ থেকে ধাঁধানো শটে বলটা পোস্টে লেগে গোলে ঢুকল। সারা ইডেন স্তব্ধ। শুধু কয়েকটা হাততালির শব্দ শোনা গেল। খেলার বয়স এখন মাত্র কুড়ি মিনিট।

সেণ্টারে বল বসাবার সময় নিমাই বলল, "উঠে খেল। প্রিয়দার দিকে আর তাকাসনি।"

পরের মিনিটেই নিমাই থেকে আব্রাহাম, আবার নিমাই এবং সে দু'জনকে কাটিয়ে রিভারস্‌ পাস দিল আমাকে। গোল হতে পারে! ইডেন দাঁড়িয়ে উঠে খ্যাপার মতো চীৎকার করে উঠল "গো ও ও ল, গো ও ও ল।" আমার সামনে গোল। স্টপার আর ব্যাকের মাঝখানে একটা ফাঁক দেখতে পাচ্ছি। দ্বিধা করলাম, মারলে যদি গোল না হয়! বরং আর একটু এগিয়ে যাই। ভুল করলাম এইখানেই। বলটা ঠেলে দিয়ে এগোতে যাবার মুহূর্তে মংবা-র পরিচ্ছন্ন স্লাইডিং ট্যাকলে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। স্টপার বলটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

যখন উঠলাম, ইডেনের আর্তনাদ তখন আছড়ে পড়ছে গ্যালারী থেকে। আমি মাথা নামিয়ে ফিরে যাচ্ছি, তখন প্যাভিলিয়নের সামনের গ্যালারি থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল, "কার ব্যাটা দেখতে হবে তো!" আমি মুখ তুলে একবার তাকালাম।

আনোয়ার অনবদ্য খেলছে, আমিয়ও। শ্যামের আজ সেই দিন, যেদিন ও পাগলার মতো খেলে। পর পর তিনটে অবধারিত গোল বাঁচিয়ে যাত্রীর ডিফেন্সকে ও চাঙ্গা করে তুলেছে। ১৮ গজ লাইনের কাছে এসে ও উইঙ্গারদের ক্রশগুলো ফরোয়ার্ডের মাথা থেকে তুলে নিয়েছে। বক্সের বাইরে পর্যন্ত বেরিয়ে এসে

চার্জ করে বল ক্লিয়ার করেছে। গোলটা খাওয়ার পরই আমাকে উপরে রেখে নিমাই আর সলিল নেমে এসেছে যাত্রীর হাফ এলাকায়।

একা মাঝ মাঠে দাঁড়িয়ে মনে হল গ্যালারি থেকে লোকেরা যদি এখন হুড়হুড় করে নেমে আসে? কেন যে মনে হল জানি না, আমি ভয়ে পিছিয়ে এলাম। আর ঠিক তখনই আনোয়ার বলটা লব করে রেঙ্গুন হাফ এলাকার ঠিক সেই জায়গায় ফেলল। যেখান থেকে আমি এইমাত্র পিছিয়ে এসেছি। রেঙ্গুনের স্টপার ছাড়া আর কেউ নেই। বলটা ধরবার জন্য সে বাঁদিকে দৌড়চ্ছে। আনোয়ার চীৎকার করে উঠল, "প্রসূন, বল ধর্।"

ওর গলার স্বরে কি যেন ছিল, মনে হল পারব। মরীয়া হয়ে ছুটতে শুরু করলাম। স্টপার যখন বুঝতে পারল তার আগেই আমি বলের কাছে পৌঁছব, শেষ চেষ্টা হিসাবে সে ঝাঁপ দিল আমার পায়ের উপর। লাফিয়ে উঠলাম, ওকে ডিঙ্গিয়ে মাটিতে পা রেখেই দেখি আমার সামনে কেউ নেই। শুধু গোলকীপার ইতস্ততঃ করছে গোল ছেড়ে বেরোবে কিনা।

বলটাকে সামনে ঠেলে লম্বা দৌড় শুরু করলাম। পিছনে পায়ের শব্দ পাচ্ছি। ইডেনের গর্জন ধাপে ধাপে উঠছে আর রেঙ্গুনের গোল ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। বক্সে ঢুকে পড়েছি। গোলকীপার এবার বেরিয়েছে। কানে তালা লাগানো চীৎকার আমার চারপাশে। বলটা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। জানি পিছনে কেউ আসছে বলটা ছিনিয়ে নিতে।

ডানদিকে হেলে বলটাকে মারার জন্য বাঁ পা তুললাম। গোলকীপার বাঁদিকে ঝুঁকল। মুহূর্তের ভগ্নাংশে বাঁদিকে হেলে ডানপায়ে বলটা আলতো করে ওর মাথার উপর দিয়ে চীপ করে পাঠালাম। বেচারা বাঁ দিকে ঝোঁকা অবস্থায় অসহায়ের মতো ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, বলটা গোলে ঢুকছে।

তারপর যাত্রীর দশজন আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল আর

গর্জনে ভেঙ্গে পড়ল ইডেনের আকাশ। যখন সেন্টারে এসে দাঁড়ালাম, তখনো বুঝতে পারছি না কি ঘটেছে। সত্যিই কি গোল করলাম! বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই হাফ টাইমের বাঁশি বাজল।

॥ ২৪ ॥

"দারুণ গোল হয়েছে।...আমি তো ভেবেছিলুম এটাও মিস্ করবি।" প্রিয়দা উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছেন।

"এই গোলই মিস্ করেছিল একজন।" পিছন থেকে একটা গলা শুনলাম। আমি ফিরে তাকালাম না। জানি একজোড়া কটা চোখ এখন আমার পিঠে বিঁধে রয়েছে। ভোলেনি, অনেকেই ভোলেনি। ড্রেসিং রুমে কে ট্রানজিস্টর খুলেছে। পুষ্পেন সরকারের গলা শুনতে পেলাম, "...শীল্ড ঘরে তুলতে পারবে কিনা এখনই বলতে পারছি না, তবে যুগের যাত্রীর তরুণ স্ট্রাইকার প্রসূন ভট্টাচার্য যে অপূর্ব দক্ষতায় গোলটি শোধ দিলো তা বহুদিন স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, এই প্রসূনেরই বাবা অনিল ভট্টাচার্য কুড়ি বছর আগে শীল্ড ফাইনাল খেলেছিলেন এই যুগের যাত্রীর হয়ে। পিতা-পুত্রে আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে খেলার নতুন নজীর আজ গড়ে উঠল। হয়তো গ্যালারিতে বসে অনিলবাবু এখন দেখছেন..."

বাবা! আসবেন কি খেলা দেখতে? কাল চারটে টিকিট পাঠিয়েছিলাম, বাড়ির জন্য তিনটে, হর্ষদার একটা। কিন্তু বাবা আসবেন বিশ্বাস হয় না। তবু আবার মাঠে নামার সময় গ্যালারিগুলোর দিকে তাকালাম। অজস্র হাত আমার উদ্দেশ্যে নড়ছে। কিন্তু আমি একটা মুখও দেখতে পেলাম না। শুধু

আবছা ঘষা কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেন হাজার হাজার বিন্দুর নড়াচড়া চলেছে সমান্তরাল কতকগুলো রেখা তৈরী করে। এর মধ্যে কোথাও কি বাবা বসে আছেন!

রেঙ্গুন ইউনাইটেড ঝড়ের মতো শুরু করল। মিনিট পাঁচেক আমাদের কাঁপিয়ে দিয়ে হঠাৎ ওদের যেন দম ফুরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী উঠে এল ওদের হাফ লাইনে। নিমাই, আব্রাহাম চমৎকার বল রাখছে মাটিতে, পায়ে বল ছিটকে যাচ্ছে স্ফুলিঙ্গের মতো। নিমাই তছনছ করেছে হাফ লাইন পর্যন্ত কিন্তু নিরেট শক্ত ডিফেন্সের পাঁচিলটা টপকাতে পারছে না। আমি জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি গোলে শট নেওয়ার। কোথাও যদি আলগা থাকে ভিতরে ঢোকার।

গোল হচ্ছে না। খেলা শেষমুখে এসে গেছে। অধৈর্য গ্যালারির গর্জন উঠছে নামছে। এমন সময় নিমাইকে ফাউল করল ওদের রাইট ব্যাক ১৮ গজ লাইনের বাঁদিকে হাত দুয়েক বাইরে। ফ্রি কিক্। বলটা বসিয়ে নিমাই আমার দিকে তাকিয়ে দুটো আঙুল দেখাল। বুঝে গেলাম ও কোথায় বল পাঠাবে। প্র্যাকটিসে এই সঙ্কেতগুলো আমরা ঠিক করে নিয়েছি। ওরা পাঁচজনে পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়েছে। নিমাই আর বিষ্ণু তৈরী হয়েছে শট নিতে। আব্রাহাম হঠাৎ বাঁ দিকে ছুটে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ওকে পাহারা দিতে গেল একজন। আমি ডানদিকে সরে গিয়ে তাকালাম ঠিক পেনালটি স্পটে। নিমাই সেটা লক্ষ্য করল। পাঁচিলের পিছনে ফাঁকা জায়গা রাখা হয়েছে, যাতে গোলকীপারের দৃষ্টি ব্যাহত না হয়। রেফারী হুইশল দিতেই নিমাই আর বিষ্ণু এগোল শট নিতে। নিমাই একটু পিছিয়ে। বোঝা মুশকিল কে শট নেবে। তবে, যে কেউই বুঝতে পারবে এটা বহু ব্যবহৃত একটা প্যাঁচ। বিষ্ণু শট নিতে এসে বলের উপর দিয়ে লাফিয়ে যাবে আর নিমাই শট করবে।

বলের উপর দিয়ে বিষ্ণু লাফিয়ে গিয়ে বাঁদিকে ছুটে গেল

কিন্তু নিমাই শট না নিয়ে বলটা নিখুঁত মাপে চীপ করল পাঁচিলের মাথা ডিঙ্গিয়ে পেনালটি স্পটের উপর। এবার সব কিছু নির্ভর করছে আমার ছুটে যাওয়ার এবং ঠিক সময়ে পৌঁছনোর উপর। দিনের পর দিন আমার পাঠশালায় পিণ্টুকে নিয়ে যার প্র্যাকটিস করেছি, এবার তার পরীক্ষা। মোটর বাইকের হঠাৎ স্পীড তোলার মতো আমি প্রচণ্ড দমকে, ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে ঢুকলাম।

দেরি হয়ে গেছে। চার পা এগোন মাত্র বুঝে গেলাম বলটাকে হাফ ভলিতে নিলে বারের উপর দিয়ে চলে যাবে। হঠাৎ বুকের মধ্যে কে বলে উঠল, "স্ট্রাইকার, এবার ঘা মারো, সর্বশক্তি দিয়ে মারো'। শেষ চেষ্টায় চার গজ দূর থেকে ঝাঁপ দিলাম। বল থেকে চোখ সরাইনি। কপালের ডানদিকে বলটা লাগছে, হাতুড়ির মতো মাথাটা দিয়ে আঘাত করলাম বলে আর মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়লাম।

চারদিক কেমন শান্ত নিস্তব্ধ! ঘাস আর মাটির মিষ্টি সোঁদা গন্ধে বুক ভরে যাচ্ছে। আমি মুখ তুলে দেখছি অদ্ভুত একটা দৃশ্য, রেঙ্গুন ইউনাইটেডের গোলকীপার গোলের মধ্য থেকে কুড়িয়ে নিল শাদা-কালো ফুটকি আঁকা আমার পৃথিবীটাকে। এরপর ধীরে ধীরে একটা গর্জন আমাকে কাঁপিয়ে দেহের উপর দিয়ে বয়ে যেতে শুরু করল।

লক্ষ্মণ মালী এসে বলল, "আপনাকে একজন মেয়েছেলে ডাকছে।"

যাত্রীর টেণ্টের বাইরে তখন উৎসব চলেছে। হাউই, পটকা আর তুবড়ির শব্দে, আলোয় আলোয় ঝলমল করছে গড়ের মাঠের এই দিককার আকাশ। বাইরে এলাম খালি গায়ে। নীলিমা আর পিণ্টু দাঁড়িয়ে। ভেবেছিলাম মাকে দেখব।

"একি তোমরা! খেলা দেখতে তুমি এসেছিলে? এখনো বাড়ি যাওনি, মা কোথায়?" একটানা অনেকগুলো প্রশ্ন করলাম। বাড়ির লোককে দেখে সত্যিই ভাল লাগছে।

"জ্যেঠিমা সকাল থেকে দক্ষিণেশ্বরে। আর জ্যাঠামশাই বললেন, একটু অপেক্ষা করে যাই, এবার হয়তো বাজি পোড়ানো হবে তাই—"

"বাবা! বাবা কোথায়?" আমার গলা ধরে এল।

"বাইরে। বললেন, তোমরাই দেখা করে এসো।"

ছুটে বাইরে যেতে গিয়ে থমকে গেলাম। তারপর ফুলগাছ-গুলোর মধ্য দিয়ে রেলিংয়ের ধারে গিয়ে বাইরে তাকালাম। একটা তুবড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। ক্রমশ আলোর ঝাড় চালচিত্রের মতো ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে পেলাম অনেক লোকের মধ্যে একজনের কপালে চিক্‌চিক্ করছে একটা টিপ। অত্যন্ত উজ্জ্বল, মর্যাদাবান।

তুবড়ির আলোয় আমাকে দেখতে পেয়ে তখন অনেকে ছুটে আসছে প্রসূন প্রসূন' বলে।

—